কবির স্ত্রী

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরমা বসে আছে।

কখন তার ডাক আসবে সেই আশায় বসে আছে।

পামেলা হায়দার বলেছে, তুমি বসো, আমি চিরকুট পাঠাচ্ছি।

এই বিশাল বাড়িটার নীচে একটা পরিত্যক্ত ঘরে সে অপেক্ষা করছে একটা চিরকুটের আশায়। আরও কেউ কেউ বসে আছে। পামেলা হায়দার রিসেপশনিস্ট— এই সদর দরজায় তারা বলতে গেলে পাহারাদার। পাশে চক্রবর্তীবাবু খটাখট নিরন্তর টাইপ করে যাচ্ছে। কাচ দিয়ে ঘেরা।

সুরমা জানে, পামেলা হায়দার ক্লায়েন্টের রুচি বুঝে লোক ঠিক করে।

আপনার কী চাই?

আমার চাই দীর্ঘাঙ্গী এক সরল বৃক্ষের মতো যুবতী।

আপনার?

আমার টিউলিপ ফুলের মতো নরম এক কিশোরী।

আপনার?

আমার চাই জীর্ণ আবাসে এক ছিন্নপত্রের মতো নারী।

ক্লায়েন্টদের এই হরেকরকম চাহিদা মাথায় রাখতে হয় পামেলাকে। এই ইন্টারন্যাশন্যাল হোটেলের এই তলাটার কোন ঘরে কে কী চায়, পামেলা ছাড়া আর কেউ জানে না। সারাদিন রুমে ফোন করলে এদের পাওয়া যায় না। তারাই পামেলা হায়দার এবং তার নম্বর দিয়ে বলে দেয়, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। পামেলা গোপনীয়তা রক্ষার্থে শুধু হাতে হাতে চিরকুট পাঠিয়ে দেয়। কত নম্বর ঘর এবং ক'তলায় কে অপেক্ষা করছে তার হদিস— ঘরে ঢুকে চিরকুটটি সযত্নে মানিব্যাগে রেখে দিতে হয়— এবং ফেরার সময় চিরকুটটি ফের পামেলাকে দিয়ে যেতে হয়— কারণ, ওতে পামেলার ছোট করে সই থাকে। গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। এত বড় নামী হোটেলের কোনও গুডউইল নষ্ট হলে তার যে চাকরি থাকবে না, পামেলা হায়দার ভালই জানে।

সুরমার আজ আসতে একটু দেরি হয়েছে— ট্রেন লেট ছিল, বেলঘরিয়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে হয় সুরমাকে। নয়াপল্লী থেকে হেঁটেও আসতে হয় তাকে— তার একটি মাত্র ছেলে, তাকে বড় করে তোলা ছাড়া এখন আর তার কোনও স্বপ্ন নেই। আজ পুত্রটির কী হয়েছে, হঠাৎ সে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছে, মা আমি আজ তোমার পাশে শোব। রোজ রোজ মাসির সঙ্গে শুতে ভাল লাগে না। তুমি আমাকে কোলে নাও মা। আমাকে আদর করো। তুমি না থাকলে আমার খুব খারাপ লাগে।

সব সময় পুত্রের আবদার রক্ষা করতে পারে না বলে তার মুখে বিষাদের ছায়া। সত্যব্রত কেন যে মরে গেল! তাকে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

পুরনো পরিত্যক্ত সোফা, কাচের টেবিল, মেরুদণ্ডহীন ভাঙা টেবিল, কাচের ডাঁই— তার ভিতর আরশোলা সব গোপন অন্ধকারে লুকিয়ে আছে— এই ঘরে বসে সবই টের পায় সুরমা।

আর এই অপেক্ষার সময়টাতেই সত্যব্রতকে বেশি মনে হয়। যদি চিরকুট না আসে, তাকে ফিরে যেতে হবে। রাত দশটা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়। সাড়ে দশটার ট্রেন ধরতে পারলে সে বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। তার ফোন নেই— ফোন থাকলে এত অসুবিধা হত না। কত যে দরকার একটা ফোনের।

■

আজকাল তাঁকে প্রায়ই কেউ নীলখামে চিঠি দিয়ে যায়। বয়স বাড়ছে। চিঠিটা গোপনে রেখে যায়, গোপনে তিনি পড়েন।— তাতে লেখা, নদী নারী নির্জনতা মানুষের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

তিনি সফল মানুষ এমনও কখনও ভাবেন। যেন ঘরবাড়ি তার ছিমছাম। অতিকায় টবে বোগেনভেলিয়া বাড়ছে— বড় হচ্ছে বুড়ো হচ্ছে। ফুল ফোটে, পাতা ঝরে যায়, শীত আসে। বসন্ত চলে যায়।

সুরমা দেখতে পায় এক বড় নদী— দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। চাঁদের আলোয় ভেসে বেড়ায় চিঠির বর্ণমালা। কার যেন সুন্দর হস্তাক্ষরে বড় মনোরম সুষমায় কথাগুলো গেঁথে থাকে মালার মতো।

সুরমা তখন সত্যব্রতকে দেখতে পায়। সে দেখতে পায় এক বড় নদী— দু'পাশে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ— মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে সত্যব্রত কোথায় যেন চলে যাচ্ছে।

তারপর পাখিরা উড়ে যায়। ছায়া পড়ে। ডানায় কুয়াশা লেগে ক্লান্ত হয় পাখিরা।

সুরমা চিৎকার করে ডাকে, আমাকে একা ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ!

গমের ক্ষেত জ্যোৎস্নায় দুলছে। বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি চুপচাপ বসে থাকে শীষে। নীলখামের চিঠি পকেটে নিয়ে সে পার হয়ে যায় মাঠ। তার হুঁশ নেই।

সুরমা বলেছিল, কেউ ডাকে শুনছ।

কে! অঃ তুমি!

অনেক রাত হল ঘুমোতে যাও।

সন্তর্পণে সত্যব্রত উঠে দাঁড়ায়। ইজি চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। তারপর ক্লান্ত এক মানুষ যেন সত্যব্রত। তার যাওয়া দেখলে এমনই মনে হয় জানালা খোলা, টেবিলে জল। রোজকার অভ্যাস, শোওয়ার আগে একগ্লাস জল খাওয়া।

খাবার টেবিলে একদিন সুরমাকে সত্যব্রত বলেছিল, আচ্ছা সুরমা তোমার মনে হয় না কোথাও যাবার কথা ছিল, হল না।

না, মনে হয় না।

মনে হয় না, আর কেউ তোমার জন্য অপেক্ষায় আছে!

না মনে হয় না। আমার সব তো তোমরা।

সুরমা কেমন কাতর গলায় বলেছিল, জানি আমার কপালে দুঃখ আছে। তুমি দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ— বেশি রাত করে ফিরছ। কোনও হুঁশ থাকছে না।

সত্যব্রত যেন বলতে পারত, বয়স বাড়লে মানুষের এটা হয়। সব থেকেও মনে হয় তার কী যেন নেই। কী যেন পাওয়ার কথা ছিল— কোথায় যেন যাবার কথা ছিল— যাওয়া হল না।

তারপর থেমে বেহুঁশ গলায় বলেছিল সত্যব্রত— এই যে সুরমা তুমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাও— কার জন্য! তুমি কি মনে করো না সংসার তোমার কাছে বেশি দাবি করছে। তোমার নিজস্ব পৃথিবীটাকে সে কখন হাঁ করে গিলে ফেলেছে।

সত্যব্রত জানে সুরমার কাছে এ-সব কথার কোনও অর্থ নেই। ছেলে মানুষ হলেই তার সব হয়ে যায়। মিনা করা গ্লাসে ঠান্ডা জল রেখে দিতে পারলেই তার শান্তি।

সত্যব্রত মনে মনে বুঝি বলল, তবু ইচ্ছে করে নদীর পাড়ে কারও উষ্ণ হাত কোলে নিয়ে বসে থাকি।

সুরমা একদিন দেখল, মানুষটা তার টেবিল থেকে সব লেখা তুলে এক এক করে ছিঁড়ছে আর বলছে সব অকারণ, সব হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে।

এই কী করছ! সে তার হাত থেকে লেখাগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

কিছু হচ্ছে না সুরমা, আমি যা লিখতে চাই পারি না।

এমন সুন্দর কবিতাগুলি ছিঁড়ে ফেললে!

কবিতা! কোথায়!

ওমা আমার কী হবে! ফোন তুলে সুরমা বলেছিল, দাদা, দাদা ও আবার মাতলামি করছে—

সত্যব্রত বলেছিল, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? আর ছিঁড়ছি না। তোমার দাদাকে আর কিছু বলতে হবে না।

সুরমা পাগলের মতো ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছিল, তোমার কী হয়েছে বলো! না হয় মাথা কুটে মরব। মানুষের যা কিছু দরকার, তোমার আছে। কিছু নেই এমন মুখ করে বসে থাকলে খারাপ লাগে না! বলো, বলো। সুরমা দু'হাত ধরে তাকে ঝাঁকাত।

সুরমা আমার কিছু হয়নি, সত্যি কিছু হয়নি। অযথা ভয় পাচ্ছ।

ঠিক আছে ওঠো। আর খেতে হবে না। এত গিলতে কষ্ট হয় না! তুমি তো একা নও। বাণীব্রত বড় হচ্ছে টের পাও না।

কিন্তু সত্যব্রত উঠত না। নেশায় কেমন ক্লান্ত— সে বলত, দূরে, যত দূরেই যাই, এক ঘন অন্ধকার যেন অপেক্ষা করে থাকে— তারপরেই চিৎকার করে উঠত, হেই মাঝি, মাঝ-নদীতে তরী ডুবিও না। পারে এক বিদ্যুৎলতার গোপন অপেক্ষা, তুমি বোঝ না! এই তরুলতা প্রান্তর জেগে থাকে কার আশায় বোঝ না— হেরে যাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া যে ভাল।

তখনই দরজা খুলে কেউ ঢুকছে, সে চিরকুটের আশায় বসে আছে, তার নাম নিশ্চয়ই লেখা আছে— এবারে সে হাতে চিরকুট পেয়ে যাবে।

পামেলা মিষ্টি হেসে বলল, হয়ে যাবে। বোসো। এই মনিকা, তোমার চিরকুট।

সুরমা হতাশ হয়।

রাতে সে কখনও বাড়ি ফেরে, আসলে ক্লায়েন্ট কি রকমের, তার উপরই সব নির্ভর করে— আজ বোধ হয় তার বাড়ি ফেরা হবে না। সে উসখুস করছে। ঘড়ি দেখে বুঝল, সময় আছে হাতে।

পামেলাও বলল, কী ব্যাপার মুখ ব্যাজার করে ফেললে সুরমা।

না, না ঠিক আছে।

তারপরেও ডাক এল, কিন্তু সুরমার ডাক নয়, অন্য কারও।

মাঝে মাঝে মনে হয় পামেলার কারসাজি, ইচ্ছে করেই দেরি করিয়ে দেয়, তার আর ফেরা হয় না— বেশি রাতে ফেরাও যায় না। আসলে অভ্যাস, লাইনের মেয়ে হয়ে গেলে, যে-কোনও পুরুষই তাকে সরোবরে নিয়ে যেতে পারে। তার নাক উঁচু অভ্যাসটাকে গুঁড়িয়ে দিতে চায় পামেলা। শত হলেও কবির স্ত্রী সে। সত্যব্রত বেঁচে থাকলে লিখত— এই সব নষ্টামি থেকে দূরে থাকা বড় কঠিন—

সত্যব্রত তুমি আমার মধ্যে নষ্টামী খুঁজে পেলে শেষে। বাণীব্রতকে কে দেখবে বল, আমার আর কে আছে!

তোমার শরীর আছে সুরমা। সত্যব্রত যেন বলল। বাণীব্রতও আছে— আমার যা ছিল, সব তো বেচে কোথায় নয়াপল্লীতে কার পরামর্শে উঠে গেলে! উপার্জনের সহজ উপায় শরীর, কিছু না থাকলেও শরীর দিয়ে মোকাবেলা করা যায় অভাব অনটনকে— বেঁচে থাকতেই টের পেয়েছিলাম, কিংশুক বলে নতুন ছেলেটি কে— মনে নেই কিংশুকের কথা— কোনও এক মনোরম সকালে সে এসেছিল কবিতা নিয়ে, সুন্দর ছিমছাম তরুণ, ধবধবে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা, সিল্কের জামা গায়ে মনে নেই। সে কবিতা লিখতে চায়। ধনির দুলাল, তোমার উপার্জনের একটা হাতিয়ার হয়ে গেল সে— মনে নেই!

মিছে কথা।

মিছে কথা নয় সুরমা।

মিথ্যে অপবাদ।

মিথ্যে অপবাদ নয় সুরমা।

তুমি থামবে।

সত্যি কথা বললে রাগ হয় তোমার!

সুরমা আমার সরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, কবিরা অভাবী হয় জানা কথা— কবিকে কেন যে বেছে নিলে জীবনে, হাড়ে হাড়ে টের পেলে কবিকে বাঁচিয়ে রাখা কত কঠিন— হাসিমুখে নিজের মতো উপার্জনে শেষে মনোযোগ দিলে।

সুরমা উঠে দাঁড়াল। সে স্বস্তি পাচ্ছে না— সত্যব্রতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার এইসব গোপন চেষ্টা ফাঁস হয়ে যাওয়ায়, সত্যব্রত কি কবিতায় মৃত্যুর ছবি ভেসে উঠতে দেখে!

জীবনে পুরুষ নারীর মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি হলে কী হয় সে জানে, এখন স্বাধীন নারী সে, একমাত্র বাণীব্রতই তার কৈফিয়ত তলব করতে পারে—

সত্যব্রত কথা কয়ে উঠল, কে তুমি নারী— তপস্বিনী হতে চাও, কবিতা লিখে হয় না কিছু আমি জানি— আর অভাব বলছ, অভাব কার না থাকে, তরুণ যুবকের হাতে রাজপাট সব আছে, তবু সে কবিতা লেখার জন্য কবির বাড়িতে হেঁটে আসে কেন বোঝো!

তুমি থামবে সত্যব্রত! আমাকে আর তুমি কোনও কঠোর বাক্যে বিদ্ধ করো না— প্লিজ। কিংশুককে নিয়ে ঠেস দিও না।

সুরমা আমার কিছু হয়নি। অযথা ভয় পাচ্ছ তুমি।

আমি অযথা ভয় পাচ্ছি সত্যব্রত! আমি বুঝি, আসলে আমার কাছে তোমার আর পাবার কিছু নেই। এখন শুধু শরীর।

শরীর হবে কেন, তুমি যে আমার চিরকুমারী।

না শুধু শরীর, সত্যব্রতকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল সুরমা।

না না তা নয় সুরমা। আমি কী করে বোঝাই! আমি জানি, এখন তুমি কাঁদতে বসবে।

রাখ তোমার হেঁয়ালি কথা! আমি কিছু শুনব না।

কেন কিছু শুনবে না।

আমার ভাল লাগছে না সত্যব্রত। টেবিলে সব রাখা আছে, খেয়ে নিও।

সুরমার মনে আছে, সে-রাতে সে ফিরিয়ে দিয়েছিল সত্যব্রতকে।

কিন্তু সত্যব্রত যে সহজে ছাড়ার পাত্র নয়।

তার পাশে বসে সত্যব্রত নানাভাবে আদর করতে চাইছে। সুরমার কেমন বমি পাচ্ছিল।

সত্যব্রত বলল, তুমি যে বলেছিলে তোমার দিন রাত কেটে যাবে কবিতা শুনতে শুনতে। তুমি কোনও অভাব বোধ করবে না।

তবু বমি পাচ্ছিল।

ঠিক আছে কথা দিচ্ছি, ছাইপাঁশ আর গিলব না।

সুরমা শরীর থেকে হাত সরিয়ে দিচ্ছে—

বললাম তো কবিতা লিখতে লিখতে আর মাতাল হব না। সাধ্বী নারী তুমি, তোমার এত সুন্দর চুল নিয়ে কী করবে, তোমার বিস্ফারিত চোখ যা দেখলেই কোনও কাজলদিঘির কথা মনে হয়— প্লিজ—

না, প্লিজ না। অনেক রাত হয়েছে, প্লিজ আর জ্বালিও না।

আমি জ্বালাচ্ছি তোমাকে।

হ্যাঁ তাই।
আমার হাতে পায়ে শরীরে আর কোনও বিদ্যুৎ তৈরি করে না তোমার শরীরে?
না।
তারপরও জোরজার করতে গেলে বলেছিল, আমাকে কি তুমি সত্যি মেরে ফেলতে চাও!
তুমি মরে গেলে আমার কী থাকল! কাকে নিয়ে বাঁচব।
কোনও সাড়া নেই সুরমার কাছ থেকে।
সুরমা শক্ত হয়ে আছে।
সে ডেকেও সাড়া পেল না।
আর তখন সুরমার বমি উঠে আসছে। সে দৌড়ে বেসিনে চলে গেল। তার বমি পাচ্ছে।
সত্যব্রত বসে বসে সব দেখছে।
যেমন জল কুলকুচা করে মুখ ধুলো।
যেমন সে ঘাড়ে গলায় জল দিল।
এক গণ্ডুষ জল দিয়ে মাথাও ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল।
সত্যব্রত বসে বসে সব দেখছে।
সুরমার নিতম্ব পুষ্ট, তার কোনও অসুখ নেই— তার স্তন পুষ্ট, তার শরীরে সব আছে— তবু কোনও আগ্রহ নেই, আকর্ষণ নেই।
সুরমা একবার চোখ তুলেও দেখেনি, সে হা-অন্ন হয়ে বসে আছে ভিখারির মতো।
তারপর মনে আছে সটান সোজা এসে খাটে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল।
সত্যব্রতর সাহসই নেই গায়ে হাত দেয়। হাত শরীরের কাছে নিয়ে গিয়েও সরিয়ে নিল। আয়নায় খাটের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে— কেমন মরার মতো সুরমা পড়ে আছে। সে দেখছে সব।
সত্যব্রত আর কিছু বলল না। আর বলতে সাহস পায়নি।
নেশা তার কেটে গেছে কি যায়নি বুঝতে পারছে না।
সত্যব্রত ওঠার সময় খিস্তি করল— শেষে শালা আমি বাড়তি লোক হয়ে গেলাম!
সকালেও বাড়িটা থম মেরে ছিল। যে যার ঘরে বসে আছে। সুরমা বাণীব্রতকে স্কুল-বাসে তুলে দিয়ে সবে এসেছে। সত্যব্রত তার ঘরে বসেছিল।
ঠিক এ-সময়ে ভুজঙ্গ এল। ভুজঙ্গকে সুরমার খুব দরকার। তাকে আসতে বলেছে। ভুজঙ্গকে বলল, দেখুন আপনার বন্ধুটি কী হয়ে যাচ্ছে। কোথায় নাকি ওর যাওয়ার কথা ছিল, যাওয়া হয়নি।
যাওয়া হয়নি যাওয়া হবে। গেলেই হবে।
ভুজঙ্গ বলল, জানেন বউদি, আজকাল কোনও অনুষ্ঠানে সত্যব্রত যেতে চায় না।
কেন যেতে চায় না, কী করে বলব।
কিছু বললেই আমাকে এড়িয়ে যায়। এক কথা, কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিল, যাওয়া হল না।
কোথায় যে যেতে চায়, তাও বুঝি না।
ভুজঙ্গ বলল, কবিদের এটা হয়। ও নিয়ে ভাববেন না। সব সময় মনে হয়, এই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল তার কবিতা।
একদিন সুরমা বলল, চল আজ ডাকঘর নাটক দেখে আসি।
দেখা বই আবার দেখবে!
চল সারাদিন আজ ঘুরব।
কোথায়!
কেন এই শহরের পার্কে। নদীর পাড়ে।
এখানে নদী কোথায়!
ভুজঙ্গ কেন এসেছে সত্যব্রত জানে। নতুন কবিতা লিখলেই ভুজঙ্গ আসে। তাকে কবিতা শোনাতে এসেছে। সে আর যে কবিতা শুনতেই চায় না— শব্দের অহংকারে নিমজ্জিত হলে কবিতা লেখার বাসনা হয়। না লিখতে পারলে কবির তখন কেমন পাগল পাগল লাগে।
সত্যব্রত বলেছিল, কবিতা থাক, তুমি কেমন আছ বলো?
ভুজঙ্গ কেমন খেপে গেল।
আমি কেমন আছি, কবিতাই তার প্রমাণ— দয়া করে কি শুনবে!
না শুনব না। বের হও শালা, কবিতা লিখে এনেছে! আমি কবিতার কী বুঝি! তুমি কেন আস আমি বুঝি না। বের হও। পাছায় লাথি মেরে বের করে দেব। কবিতার নামে ছেনালিপনা। আমি কিছু বুঝি না মনে কর!
ভুজঙ্গ কেন যে রেগে গিয়ে বলল, ঠিক আছে শুনতে হবে না।
বউদি উঠছি।
সত্যব্রত বলল, সেই ভাল।
ভুজঙ্গ আর সত্যব্রতের সঙ্গে একটা কথাও বলল না। সে রাস্তায় নেমে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। এই দুর্ব্যবহার কেন! কোথাও কবির জীবনে কি কাঁটা ঢুকে গেছে!
তারপরই মনে আছে সুরমার, পেটে ব্যথা সত্যব্রতর। তারপরই জানা গেল সে লিভারের অসুখে ভুগছে। দাঁত চেপে অফিস যায়। কবিতা লেখে, যেন তার কিছুই হয়নি— কবিতা লিখতে লিখতে যদি আবার সে নিরাময় হয় এই আসাতেই সুরমার অপেক্ষা।
তারপর তো জীবনটাই চুরমার হয়ে গেল।
সত্যব্রত আর নেই।

তখনই দরজা খুলে আবার পামেলা হায়দার— এই নাও সোজা তিনতলা— তিনশো তেরো নম্বর ঘর।
আবার ভুজঙ্গ হাজির।
বউদি স্মরণসভা করতে চাই কবির।
করুন।
আপনাকে যেতে হবে। মণিদাকে বলেছি। তিনি রাজি হয়েছেন। কত বড় কবি তিনি। আরও সব তরুণ কবিরা আসবে। কলকাতা থেকেও কিছু কবি যাচ্ছে। মণিদা বলেছেন, সুরমা যেন আসে।
তাকে যেতে হবে কেন, সে গিয়ে কী করবে। এটা কি কোনও বিজ্ঞাপন তরুণ কবির— এই তার স্ত্রী, এই সুরমার সেবা শুশ্রুষায় তরুণ কবির মৃত্যু এবং তার স্ত্রী উপস্থিত থাকলে স্মরণসভার গাম্ভীর্য বাড়ে— তাকেও কিছু বলতে হবে—
সুরমা তিন তলার তিনশো তেরো নম্বর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ডোরবেল বাজিয়ে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না।
চিরকুট মিলিয়ে দেখল, না সে ঠিক দরজাতেই অপেক্ষা করছে। তার কোনও ভুল হয়নি। তিনশো তেরো নম্বর ঠিকই আছে। সে ঘড়ি দেখল, আটটা বেজে গেছে— তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারলে দশটা তিরিশের লোকাল পেয়ে যাবে— বাণীব্রত কী করছে! পড়ার টেবিলে, না কি বায়না করছে সুকুমারীর সঙ্গে। তবে সুকুমারী জানে, বউদি ফিরলে শেষ ট্রেনেই ফিরবে। ক্লান্ত অবসন্ন এক নারীর মুখ দেখার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়। লাস্ট ট্রেন চলে গেলে সে শুয়ে পড়ে।
বাণীব্রত তখন ঘুমিয়ে পড়ে। সুকুমারী জানে দরজা খুলে দিলে সুরমা সোজা বাথরুমে— তার ধোওয়া শাড়ি সায়া ব্লাউজ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে হয় তাকে।

■

মণিদা মানে মণিরত্ন বসু, বিখ্যাত কাগজের সম্পাদক এবং কবি। তিনি কথা দিয়েছেন, স্মরণসভায় থাকবেন।
ভুজঙ্গ অনুরোধ করলে তিনি না করতে পারেন না—
ভুজঙ্গ চা খেয়ে চলে যাবে এমন সময় তিনি বললেন, কী যেন নাম কবির। এত কবি যে নাম মনে রাখতে পারি না।
তিনি নাম জানেন না সে জন্য দুঃখিত নয় ভুজঙ্গ। কারণ, ভুজঙ্গ তাঁকে চেনে— কিছুটা খেয়ালি মানুষ, তিনি কবিতার মডেলই বলা চলে। সত্যব্রতর কবিতা সম্পর্কে তাঁর কিছু মন্তব্য স্মরণসভায় যথেষ্ট গুরুত্ব তৈরি করবে। তাঁর কাগজেও যে তরুণ কবির স্মরণসভার ছোটখাট হাফ কলামের মতো খবর থাকবে, সঙ্গে পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি যদি ছাপা যায়, তবে সত্যব্রতের শেষ কাজটায় কবিদের আন্তরিকতার একটা নিদর্শন থাকবে।
তিনি নাম মনে করতে না পারায় ভুজঙ্গ বিশেষ আহত হয়নি। একজন তরুণ কবির প্রতি এটা অপমানজনক কিছু সে মনে করে না।
ভুজঙ্গ সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল— সত্যব্রত, ইদানীং খুব নামটাম করেছিল, আপনার কাগজেও তার কবিতা ছাপা হয়েছে। ওর একটা লাইন আপনার ভাল লাগবে—
বন্ধুর শ্মশানে স্ত্রী একা/রক্তজল করা দেহে/এখনও নখের দাগ/যা অস্তিমে শেষ সূর্যাস্ত/ তবু থাকে জেগে—/ তুমি কার কে তোমার?/ হাড়ে মজ্জায়

ভেসে বেড়ায়/বরফের কুচি।
তিনি বললেন কী করে মারা গেল!
অসুখে মারা গেল।
ফের বলল, ঠিক অসুখ না। সুরমা বলল, ইদানীং সে পর্যাপ্ত মদ খেত। দু-তিনদিন বাড়ি ফিরত না। কলকাতায় এলে কখনও ওকে সুস্থ দেখিনি।
তিনি ভুজঙ্গের কথায় ফিক করে হাসলেন, তারপর দরজা খুলে বের হবার সময় বললেন— সত্যব্রত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল — কবিদের এটাই রোগ— তারা রাস্তা হারিয়ে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।
তিনি বললেন, আসলে শরীর। শরীর তো মানে না— মানুষের বাসনা কামনার তো শেষ নেই।
এই সব কথা পরে ভুজঙ্গই সুরমাকে বলেছে।
কতক্ষণ হয়ে গেল— দরজা খুলছে না, ভিতরে কি কেউ নেই! সুরমা দ্বিতীয়বার বেল টিপতে সাহস পাচ্ছে না। পামেলা হায়দার বলেছেন, খুবই গুণী মানুষ— কাগজের জগতে বাবুর খুব নাম ডাক আছে শুনেছি। বাঙালি— বোম্বের বড় একটা কাগজের সঙ্গে যুক্ত।
তার অর্থাৎ সুরমার আর সাহসই হচ্ছে না দ্বিতীয়বার ডোরবেলে হাত দিতে।
অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।
সতর্ক থাকতে হয়।
হোটেলের লম্বা করিডোরে নীলরঙের কার্পেট পাতা। পায়ের শব্দ শোনা যায় না।
একজন মেয়েকে বগলদাবা করে এইমাত্র একটা লোক দরজা খুলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ছে।
তাকে দেখে মণিদাও খুব উৎফুল্ল হয়েছিলেন।
তুমি এসেছ! এমন বলেছিলেন। সে না এলে শুধু কবির নয় কবির অনুগামীদেরও মর্যাদা বাড়ে না। কেন যে এমন মনে হয়েছিল সুরমার।
এই হোটেলে ঢুকলে এবং ক্লায়েন্টদের ঘরে ঢুকলেও সত্যব্রত যেন তাকে অনুসরণ করে।
খুব সুখে আছ মেয়ে।
খুব হচ্ছে!
আর আমি বাড়তি মানুষ হয়ে গেলাম!

■

তিনি সবই শেষপর্যন্ত দেখতে পেলেন।
স্টেশনে তরুণ কবিরা এসেছিল তাঁকে নিতে।
ওরাও বলেছিল, আপনার কথা খুব বলত সত্যব্রত।
বাড়িতে সুরমা বলেছিল, আপনার কথা খুব বলত।
কারণ, সুরমার আষ্টেপৃষ্ঠে এখনও তাঁরা লেগে আছে। মৃত্যুর ছবি থেকে চিতার আগুন সবই। মণিদা বলেছিলেন, এই বয়সে এতবড় শোক, তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আমার ভাষা নেই, অথচ সুরমাকে যে কুমারী মেয়ের মতোই মনে হচ্ছে এটা বলেননি। কারণ, বের হবার আগে সুরমা আয়নায় নিজেকে দেখে আঁৎকে উঠেছিল— একেবারে তাজা ফুল ফোটার বয়স যেন। এতটা পরিপাটি করে সে নিজেকে আবিষ্কার না করলেই পারত।
সে চোখ বুজে ফেলল।
সেই ছেলেবেলার নিষ্পাপ মুখ— শরীরে যে দাবদাহ থাকে বড় হবার মুখে টের পেলেও কোনও নরক যন্ত্রণায় ডুবে যেতে হবে সে স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেনি—
দ্বিতীয়বার বেল না টিপলেই নয়। খুবই সাহসী হতে হয়, বেলঘরিয়ার লোকালে বসে মেয়েটি তাই বলেছিল, আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন।
সুরমা বলেছিল, হ্যাঁ কলকাতায় যাচ্ছি। কলেজস্ট্রিটে একটু কাজ আছে।
আপনি কবি সত্যব্রতের স্ত্রী না?
আজ্ঞে।
আপনি নয়াপল্লী কলোনিতে এসেছেন।
আজ্ঞে।
সত্যব্রতের কবিতা আমারও ভাল লাগে।
মেয়েটি বলেছিল, কিছু যদি মনে না করেন, কলেজস্ট্রিটে কি আপনার খুব জরুরি দরকার!
কবির একটা বই বের হবে। ওঁর বন্ধুরা আসবেন, ওরাই মানে তার বন্ধুরা, সবাই তরুণ কবি, তারাই বের করছে! এই করেই মেয়েটার সঙ্গে কথা হয় এবং ক্রমে সখ্য বাড়ে— মনে আছে মেয়েটির নাম কল্যাণী বিধবা মা-এর একমাত্র মেয়ে সে, বাড়িতে ছোট ছোট চারটি ভাই আছে তার।
কিছুদিন যাওয়া আসার মধ্যেই টের পাওয়া গেল, সে লাইনের মেয়ে, সেই বলেছিল সাহসী না হলে বেঁচে থাকা যায় না— করুণা ভিক্ষা করে কতদিন চলে বল?
আসলে, এই যে তার দ্বিতীয়বার বেল টেপা কল্যাণীর কথা মনে না পড়লে সে যেন সাহস পেত না— তোমার মন না থাকতে পারে, স্বকীয়তা আছে। পুরুষ শাসিত সমাজে বাঁচবে, অথচ সাহসী হবে না, করুণা ভিক্ষা করে বেড়াবে, মনুষ্যত্বের যে বড় অপমান।
কল্যাণীই প্রথম তাকে বলেছিল, শরীরই সম্পদ। কিসের লজ্জা! পুরুষ তোমাকে ভোগ করবেই, সব পুরুষ-ই চায় অন্য নারী— একা একা পড়ে মার খাচ্ছ।
সত্যব্রতর একটা কবিতার বই আমি কিনতে চাই।
তোমার বাড়িতে গেলে পাওয়া যাবে, বাণীকে কোন স্কুলে শেষে দিলে—
সুরমা স্কুলের নাম বললে, আরে ওটা তো বাংলা স্কুল, ওখানে দিলে মানুষ হবে! সরকারি প্রাইমারি স্কুলে কোনও শিক্ষার পরিবেশ আছে!
আমার ক্ষমতা কোথায় বল।
ক্ষমতা নিজের মধ্যে তৈরি করতে হয়। সুরমা তোমার কোনও উচ্চাশা নেই।
সেদিন বোধ হয় সুরমা হতাশ গলায় বলেছিল, আর উচ্চাশা!
না না, ইংরাজি স্কুলে দাও।
কল্যাণী যে এই কলোনির অন্য অনেকের চেয়ে মানবিক, তার আসা যাওয়ার মধ্যে সব আচরণই ফুটে উঠছে। এমন কি কল্যাণী বাণীব্রতর স্কুলড্রেস এবং বইও কিনে দিয়েছিল।
দুরবস্থার এক শেষ।
কল্যাণী হাত ধরে যেন টেনে তুলছে।
চাকরি করবে?
কোথায়?
খুঁজতে হবে।
পাওয়া যায় না। আমার বিদ্যাবুদ্ধি অতটা নেই যে চাকরি করতে পারি।
কেন তোমাকে কবির অফিস থেকে ডাকেনি?
তাদেরই উচিত ছিল, তোমাকে নিয়ে নেওয়া।
নেয়নি।
তুমি চেষ্টা করনি!
না।
না কেন?
ওরা সত্যব্রতর কবিতা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করত। সত্যব্রতই বলেছে, এরা কী নিষ্ঠুর! কবিতা পড়ে না।
সেই। কবিতা পড়তে কেউ চায় না। নির্মল জীবনের ছবি সবাই চায়। আমি বুঝি, তুমিও চাও, কিন্তু পাবে কোথায়। নির্মল জীবনে ঢুকে অন্নসংস্থান— আমাদের সমাজে সম্ভব নয়।
সরকারি প্রাইমারি স্কুলেও চেষ্টা করেছি— হয় না। রাজনৈতিক দাদা না থাকলে।
কল্যাণী বলেছিল, আমি জানি, নেতাদের হাত তোলা হয়ে থাকলে সব হবে। আমারও হয়নি।
সত্যব্রত বলেছিল, কোনও রাজনৈতিক শালা যেন আমাদের বাড়িতে না ঢোকে। এরা কবিতা পড়ে না। এদের আমি চিনি।
তখনই দরজা খুলে দিল কেউ।
সুরমা বুঝল না কে খুলে দিয়েছে। ভিতরে একজন লম্বা মতো মানুষ জানালার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে— সে কিছু দেখছে। কে ঢুকল, সে কে, তার যেন জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই।
চিরকুটটি না দেখালে সে দরজা বন্ধ করতে পারে না— লোকটি পরে আছে লম্বা ঘুমের পোশাক। ঘরের ঠান্ডা আমেজ ঘুম পাওয়ার মতো— সুরমা দেখল, বেশ বড় ঘর সোফাসেট সব সাদা ওয়াড়ে ঢাকা। বাতিদানে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা, সুগন্ধ ধূপের গন্ধও পেল সে।
সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রতর স্মরণসভাটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—
স্কুলের একটা হলঘরে সত্যব্রতের ছবি রাখা। কিছু রজনীগন্ধা এবং ধূপদীপ যা না জ্বালালে আন্তরিকতার স্পর্শ থাকে না— সবই ছিল। এই ঘরেও সেই ধূপের গন্ধ যেন। লোকটি একবারও মুখ ফেরায়নি— জানালায় দাঁড়িয়ে শহরের বড় বড় হাইরাইজ় বিল্ডিংগুলি দেখছে। ফুটপাথে ভিখারিরা বসে আছে—

তাদেরও দেখতে পারে— তবে লোকটা কী দেখছে সে জানে না।
কবিরা স্মরণসভায় সত্যব্রতের কবিতা পাঠ করেছিল।
ভুজঙ্গ বলল, সুরমা আমরা চাই তুমিও আজ ওর একটা কবিতা পাঠ করবে।
সুরমা তখন স্থির ছিল না। অবিচলও নয়— তার ভিতর থেকে কান্না উঠে আসছিল, সে শুধু বলেছিল, না, না, আমি পারব না।
এক এক করে সব তরুণ কবি এসে তাকে অনুরোধ করছে, আপনি পড়ুন দিদি।
শেষে সবাই ভুজঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকল— সেই একমাত্র অনুরোধ করেনি। এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণিকে তিনি অনুরোধ করলে, সুরমা তাঁর কথা ফেলতে পারবে না। ভুজঙ্গ কবি মণিরত্নকে বলল, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, মণিদা আপনি বললে আপনার কথা ফেলতে পারবে না। ফিসফিস করে বলল, সত্যব্রতকে সুরমা ভালবেসেছিল, তার কবিতাকেও। ধন নয়, মান নয় ছোট্ট এ-তরী। তরীখানি কবিতার। সুরমা কবিতা পাঠ না করলে সত্যব্রতর আত্মা শান্তি পাবে না। কবিতা ভালবেসে বিয়ে।
সুরমা সাদা জমিনের লতাপাতা আঁকা শাড়ি পরে আছে। কপাল সাদা, চুল শ্যাম্পু করা। হালকা প্রসাধন। নাক চাপা, সুন্দর মুখে তা মানিয়ে গেছে। হালকা ঠোঁট।
তিনি অর্থাৎ মণিরত্ন, সুরমাকে ইশারায় ডাকলেন। তিনি সহসা সুরমার কানে কানে বললেন, নীল খামে সব সময় কেউ চিঠি রেখে যায়! যতকাল জীবন— ততকালই এই চিঠি পাবে। ভোগের বিষয়ে কিছুই প্রত্যাখান করো না। একটাতো জীবন, সবতো এক জন্মের রহস্য— ভাল লাগবে না কেন!
স্মরণসভায় তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব। স্মরণসভায় তিনি যেন তাকে এ-সব না বললেই পারতেন। সুরমার চোখমুখে রক্তাভ ইষৎ লাজুক আভাস দেখাচ্ছিল।
তিনি বললেন, সত্যব্রত তার খোঁজেই ছিল— রাস্তা না হারালে কেউ আত্মহত্যা করে না।
শোকসভা এবং আত্মহত্যা এই দুটো শব্দ বন্ধই তিনি কিছুটা জোরে উচ্চারণ করেছিলেন। এটা এমন কোনও অশ্লীল শব্দ নয় যে তিনি খোলামেলা ভাবে তার আভাস দিতে পারেন না। তাঁর কোনও জোরে উচ্চারণ না করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।
স্মরণসভায় কিন্তু তাঁর এই নীল খামের চিঠির কথা কেউ তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হবে বিশ্বাস করতে পারেনি। তিনি কবি মানুষ, দীর্ঘ পথ কবিতায় তার কালক্ষেপ হয়ে গেছে— নীল খামে চিঠি খুবই সাধারণ কথা এই জীবনের। আবার এটা কোনও জীবনসত্যের কথাও প্রকাশ করতে পারে।
কেউ কেউ স্তম্ভিত— কারণ, এই সব কথা সমূহের অন্তরালে জীবন যে ভোগ করার কথা থাকে তাই যেন প্রকারান্তে বুঝিয়ে দিলেন।
সুরমাও এই কথায় যেন কিছুটা আহত হয়েছিল। শত হলেও একজন কবির স্মরণসভায় এমন সব কথা মানায় কি না সে বুঝতে পারছিল না। স্মরণসভায় কবির গুণকীর্তনই কাম্য।
ধূপ দীপ জ্বলছে। ধোঁয়ায় সত্যব্রতর প্রতিকৃতি কিছুটা আবছা। সত্যব্রত সুঠাম বলশালী যুবক, মুখে কবিতার মায়াবী ঘ্রাণ যেন লেগে আছে। এই সেদিনও সে ছিল, আজ আর নেই। তিনি সত্যব্রতের ছবি দেখে অনুমান করলেন, বয়েস চল্লিশও হয়নি।
তিনি বললেন, সুরমা তোমাদের কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল?
ভুজঙ্গ আর পারল না। মণিরত্নের পাশেই বসে আছে। সে মুখ কানের কাছে নিয়ে বলল— এখন এ-সব কথার সময় নয়। আপনি সুরমাকে সত্যব্রতের কবিতা পড়তে বলুন।
তিনি কিছুই শুনছেন না। কে জানে এই স্মরণসভা, তারপর সুরমার মতো কাচা-বয়স, এবং তার লাবণ্য তাঁর মধ্যে কোনও ঘোর সৃষ্টি করছে কি না!
কবিতার তরুণ তরুণীরা মুখ নিচু করে বসে আছে। সত্যব্রত তাকিয়ে আছে দেওয়ালের দিকে— ঠিক যেখানে সুরমা বসে আছে— যেন সে সুরমাকে দেখছে।
সত্যব্রত আত্মহত্যা করেনি কথাটা বলতে কেউ সাহস পাচ্ছে না।
সত্যব্রত লিভারের অসুখে মরে গেছে— ক'দিন তার গলা দিয়ে রক্তপাত হল এবং সে সময়ও সত্যব্রত লিখে গেছে— জর্জরিত আত্মা, তীব্র যোনিদেশ, ভিখিরি নিদেনপক্ষে। সেবা শুশ্রুষার চেয়ে কাম্য দূরবর্তী অগ্নিশিখা লাভা, গলিত শব এবং দুর্গন্ধ মিলে নারীর নাভিমূলে পড়ে আছি সখা—। এ-সবে প্রমাণ হয় সত্যব্রত আত্মহত্যা করেনি। কঠিন পরীক্ষায় সে পৃথিবী ছেড়ে গেছে। মৃত্যুর কাছাকাছি খবরেও সে কবিতা হয়ে নারীর যোনিদেশ জয় করতে চেয়েছিল। পারেনি।
তিনি অর্থাৎ সভার মুখ্য ব্যক্তিত্ব মণিরত্ন বেশ জোরে জোরে মাইকে আবার বলেছিলেন, সরমা তুমি কি নীল খামে চিঠি পাও!
সরমা মাথা নিচু করেই বসে আছে।
কী বল! জীবনসত্য কী বলে?
আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আপনার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। সুরমা বলল।
আরে তোমার শরীর কী বলে।
ভুজঙ্গ বলল, মণিদা আপনার এ-সব কথার কী মানে!
সুরমা জানে। সে নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পারছে। সে মানে কী, তা ঠিক বুঝেছে।
ভুজঙ্গ বলল, মণিদা আপনি চুপ করুন। আজ স্মরণসভায় আমরা শুধু তার কবিতা নিয়েই আলোচনা করব। তার কবিতার কথা বলুন— তার কবিতা নিয়ে আলোচনা করলে কবির গুরুত্ব বাড়ে।

সুরমা খুবই কাতর হয়ে পড়েছিল। তার শোকাশ্রু যে কারণে বড় হয় এবং পাশাপাশি হাঁটে তার জন্য। তার শোকাশ্রু— তাকে ছোঁয়া যায় না বলে, ধরা যায় না বলে।
সুরমা মুখ তুলছে না।
সে সেই একইরকমভাবে লজ্জায় যেন মুখ আড়াল করার চেষ্টা করছে। তিনি বড় কবি, ধরে ফেলেছেন।
সুরমা কাঁদছে।
ভুজঙ্গ ভাবল, আচ্ছা ঝামেলা। সুরমার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে পারছে না।
তিনি ভাবলেন, কী করে যে এমন একটা বিষয় থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
তিনি খুব দ্রুত বলে গেলেন— বরং আমি আবার সত্যব্রতের কবিতা পড়ে শোনাই তোমাদের।
তখনই ভুজঙ্গ টের পেল, কাঁধে কার হাত! মনে হল চার দেয়াল থেকে সত্যব্রত যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে— না না, আর না, অনেক বরফকুচি হাড়ে মজ্জায় ঢুকে গেছে। আর না।
এই বরফকুচি নিরন্তর মানুষের রক্তমাংসে খেলা করে বেড়ায়।
কে আছে তোমরা বল, তোমরা বল, সুরমার মতো সুন্দরী নারীর টানে এখানে আসেনি! শোকসভা না কামুকের সভা। ভুজঙ্গ তার কাঁধ থেকে হাতটা সরাতে ভয় পাচ্ছিল, সত্যি যেন কঙ্কালের স্পর্শ পাবে। অন্তরাল থেকে কেউ বলছে যেন, সুরমাকে বলতে দাও। আজ আমার কবিতা নয়। আমার কবিতার আবৃত্তি নয়।
ভুজঙ্গ কেমন শিথিল হয়ে গেল। কবিতা কি তবে শেষ পারানি নয়। নারীও শেষ পারানি নয়। অন্য কোনও বৃক্ষের ছায়া কি মানুষের জন্য তবে অপেক্ষা করে থাকে?
ভুজঙ্গ সহসা থেমে গেল। সে আর কী বলবে বুঝতে পারছে না।
এই স্মরণসভায় শুধু তখন ধূপ দীপ জ্বলছে। রজনীগন্ধার সৌরভ ছড়াচ্ছে।
নীল খামের চিঠি কে দেয় সুরমা? মাইকে মণিদার গলা গমগম করে বাজছে।
ভুজঙ্গ আর না বলে পারল না, আপনি উঠুন আপনাকে আর কিছু বলতে দেওয়া হবে না।
তিনি বললেন, ভুজঙ্গ তুমি আমাকে মাতাল ভাবলে!
আমি তো তার কবিতা নিয়েই আলোচনা করছি— মৃত কবি বলছ কেন, কবির কখনও মৃত্যু থাকে না। মৃত কবি বলে তোমরাই তাকে অপমান করছ।
তারপর মণিরত্ন কবিদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কবির কখনও মৃত্যু হয় না। আপনারা বলুন, কবির কখনও মৃত্যু হয়! দ্বিপ্রহরে জলতেষ্টা, আগুন হয়ে জ্বলছে বুকে— এক বিন্দু জলসিঞ্চনে সে থাকে সুখে।
অর্থাৎ তার সেই জলতেষ্টার কথা মনে রাখতে হবে। নারীর কাছে পুরুষের আর কী ভিক্ষা চাইবার থাকে বলুন।
সবাই সমস্বরে বলল, সত্য সত্য সত্য। সবাই তিন সত্য উচ্চারণ করলে তিনি বললেন— এই যেমন যে টানে সুরমা তুমি সত্যব্রতের কাছে চলে এসেছিলে, সেই টানে আবার কোথাও ভেসে পড়তে ইচ্ছে হয়নি? সত্যি করে বল— এই স্মরণসভায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাক— আমরা যে যাই বলি, প্রত্যেকের কাছেই কেউ দিয়ে যায় নীল খামে চিঠি। কেউ পায়, কেউ পায় না— দুর্ভিক্ষ নারীর, দুর্ভিক্ষ পুরুষের— কোনও লেনদেন থাকে না, নারী ও পুরুষের।

ভালবাসা মৃত বৃক্ষ হয়ে পড়ে থাকে— কারণ, ভালবাসাও দিনক্ষণ মানে— ভালবাসা দীর্ঘ সময় থাকে না। শুধু শরীর চিতা হয়ে জ্বলে।

সত্যব্রত এই জ্বালায় অস্থির হয়ে না পড়লে সে শেষ হয়ে যেত না। কী তুমি সুরমা, কী ঠিক করেছ কোনও কথাই বলবে না!

ভালবাসার বয়স কত, সুরমাকে আবার প্রশ্ন। অন্তত বুঝতে দাও, আমি ঠিক বলেছি কি না।

সুরমা সহসা কেঁদে ফেলল।

আমাকে ক্ষমা করুন দাদা।

ক্ষমার কথা উঠছে কেন— যদি আমি যথার্থ উক্তি করে থাকি তাকে স্বীকার করলে তুমি আজ ধন্য নারী— স্বাধীনতা, স্বাধীনতা চাই শরীরের। অমোঘ এই অস্তিত্ব নারী ও পুরুষের। তুমি ধন্য নারী।

ভুজঙ্গ ক্ষেপে যাচ্ছিল— বড় কবি হলেই কি যা কিছু ইতর কথা বলা যায় মণিদা?

মণিরত্ন কেমন অবাক হয়ে ভুজঙ্গকে দেখছেন। ইতর কথা, সে আবার কী। নিষ্ঠুর সত্যকথা কি কখনও ইতর হতে পারে!

■

কী হল! তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছ! কখন দরজা খুলে দিয়েছি। ভিতরে এস।

কেমন বেহুঁশের মতো সুরমা এদিক ওদিক তাকাল। চিরকুট দেখে সে নম্বর মিলিয়ে নিয়েছে। সত্যব্রতের স্মরণসভার দৃশ্যগুলিও অদৃশ্য। মানুষটা তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে, সে তার মুখ তুলছে না, সে শুধু অনুসরণ করছে।

একটা বেশ বিদেশি সুগন্ধ শরীরে। এখানে এলেই সুরমা এটা টের পায়। গন্ধটা সে পায় এক নম্বর লাউঞ্জ থেকে। যত সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে, যত নানারকমের কারুকাজ করা দেওয়ালের পাশে হেঁটে যায়, তত গন্ধটা সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে। সহজেই তখন সে ভুলে যেতে পারে তার নাম তার পারিবারিক অস্তিত্ব।

সে এখানে হৈমন্তি।

মানুষটা পর্দা তুলে ওকে ঢুকতে দিল। তারপর পর্দাটা ফেলে দিল। দরজা বন্ধ করল না। ওটা হৈমন্তি নিজে বন্ধ করে একটু সরে দাঁড়াল।

মানুষটার কি নাম, কোথা থেকে এসেছে হৈমন্তি জানে না, তার জানার কথাও নয়। তবে কিছুকিছু জানে।

সে যেমন নামে চিহ্নিত, মানুষটিও এই ঘরের নম্বরে চিহ্নিত।

তিন'শ তেরো নম্বরের মানুষটা ফোনে শুধু বলেছে, কেউ আছে, থাকলে পাঠিয়ে দেবেন।

পামেলা বলেছিল, চিন্তা করবেন না, পেলেই পাঠিয়ে দেব।

কে আসবে যেমন ক্লায়েন্ট জানে না, কার ঘরে সে ঢুকবে, সেও জানে না। আসলে, দু'জন অপরিচিত নরনারীর এই যে দেখা হওয়ার অভ্যাসটা সুরমা কিছুদিনের মধ্যেই রপ্ত করে নিয়েছে। তার আজকাল কোনও অস্বস্তি হয় না ঠিকই, তবে ভয় থাকে এবং কিছুটা সংকোচও থাকে— কারণ, পুরোপুরি সে লাইনের মেয়ে হয়ে যেতে পারেনি।

সুতরাং লোকটার কি নাম, কোথা থেকে এসেছে সে জানে না।

সে চোখ মেলে এবার ভাল করে দেখল।

তার নম্বর ঠিক থাকলেই হল। সময়ের কথাও লেখা থাকে— এ পর্যন্ত ঠিক থাকলেই হৈমন্তির অস্বস্তি কেটে যায়। ভুল করে অন্যঘরে ঢুকে দু'বার সে খুব ফ্যাসাদে পড়েছিল। নম্বর না মেলায় পামেলা সে রাতে টাকা নিয়ে খুব ঝামেলা পাকিয়েছিল।

আপনি মাতাল না শুধু। আপনার মাথায় কেউ পেরেক পুঁতে দিয়েছে।

সুরমা শোক সামলে তখন মহিকে বলছে, আমি খুব বড় কিছু আশা করেছিলাম। সে যে দুর্ভিক্ষ লাঞ্ছিত পুরুষ, সে যে শরীর ছাড়া কিছু বুঝবে না আশাই করতে পারিনি।

তিনি বললেন, বল, বল। লজ্জার কী আছে। আমরা তো এই রকমেরই। সত্য কথা বললে দোষ হয় না।

সুরমা বলল, বড় বলতে এই নয় টাকা মান যশ— ঠিক এমন কিছু যা খুব কাছের হয়ে যায় না— দূরত্ব থাকে।

তিনি বললেন, নারীর সঙ্গে সঙ্গ করলে তার আর থাকে কী— জীবনে সঙ্গম দরকার— সঙ্গমের মধ্যেও কবিতা থাকে।

ভুজঙ্গ আর না বলে পারল না, আপনি উঠুন। আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না।

আমি মাতাল! তুমি বলতে পারলে আমি মাতাল!

হ্যাঁ আপনি মাতাল।

অনেক নষ্টামী সহ্য করা গেছে। স্মরণসভায় নারীর সঙ্গে দিনযাপনের কথা আসে কি করে! আপনি নিজের মধ্যে ঠিক নেই। আপনাকে আর বলতে দেওয়া হবে না।

দু-একজন তরুণ কবি ছুটে আসছে। ডায়াসে উঠে তারা ভুজঙ্গকে সামলাচ্ছে।

কী করছেন! মানুষটাকে তো আমরা চিনি। তাঁর কবিতা সত্যব্রতর বেদবাক্য হয়ে আছে। আমাদের কাছেও উনি — না না তিনি উঠবেন না। তাঁকে বলতে দিতে হবে।

মণিরত্ন বললেন, আমি কাউকে খাটো করতে চাইনি। ভুজঙ্গ তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন?

ভুজঙ্গ বলল, চ-উ-প। তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইল।

সুরমা দরজায় দাঁড়িয়ে বাধা দিল। বলল, আমি যদি তাকে আর একটু ভালবাসতে পারতাম। ও কাছে এলেই আমার কেমন বমির ভাব হত। আমি কী করব। জোর করে কিছু হয় না। সম্পর্কটা শরীরের।

ভুজঙ্গ 'থ' হয়ে গেল।

সুরমা আর কাউকে ভালবাসে!

সুরমা বলল, ভুজঙ্গদা সত্যব্রত আত্মহত্যা করেছে। উনি ঠিকই বলেছেন।

লোকটি এখন পিছন ফিরে আছে। লম্বা মানুষ। সাদা সিফনের পাঞ্জাবি গায়। নীচে গেঞ্জিও নেই। পাজামা ডোরাকাটা। খুব হাল্কা পোশাকেই রয়েছে।

লোকটি তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, বোসো।

সে পাশের ডিভানে বসে পড়ল।

এ-সব সময়ে তার কপালে সামান্য ঘাম দেখা দেয়।

যতক্ষণ না লোকটা সহজ হয়ে তার পাশে বসবে, দুটো ভাল কথা বলবে, অবশ্য সবাই এক রকমের হয় না— কেউ দরজার পরদা পড়ে গেলেই সাপটে ধরে এবং যেন কত অধীর হয়েছিল তার জন্য— ঢোকামাত্র কথা নেই বার্তা নেই— টানতে টানতে নিয়ে বিছানায় ঠেলে ফেলে দেওয়ার স্বভাব থাকে কারও। খোলাখুলির সবুর সয় না। সাধারণত এ-সব মানুষকেই হৈমন্তি পছন্দ করে বেশি। তাদের কাছ থেকে সহজেই ছুটি পাওয়া যায়।

লোকটা এখন কাচের অতিকায় দেওয়ালের ওপাশে পরদা সরিয়ে তাকিয়ে আছে।

হৈমন্তি বসে থেকেই শহরের দূরে বড় মাঠ, গীর্জা ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গের ছবি দেখতে পাচ্ছে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে যখন, তখন অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছে। হৈমন্তি বটুয়া থেকে রুমাল বের করে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম এই অবসরে মুছে নিল। এবং ছোট্ট আয়নায় নতুন করে প্রসাধনটুকু সেরে ফেলতেই দেখল লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

হৈমন্তি চোখ তুলে তাকাল না— চকিতে আড়ালে শুধু দেখল, খুবই সম্ভ্রান্ত চেহারা। সে এগিয়ে আসছে। হৈমন্তি আলগা হয়ে বসল। শরীর ছেড়ে দিল এবং যেভাবে দেখলে অনাহারী মানুষের মতো মুখে প্রলোভন চকচকে করে ঠিক সেই ভাবটা শরীরে ভাসিয়ে রাখল।

কিন্তু লোকটা খুবই স্বাভাবিক ভাবে, যেন সে তার আত্মীয় কুটুম তার এক দূর সম্পর্কের মেজদার মতো প্রায় স্বভাবে— পাশে বসে লাজুক ছোকরার মতো তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

বলল, তোমার নাম কী?

নাম!

তোমার নাম।

হৈমন্তি।

ঠিকই আছে, তুমি হেমন্তকালের মতোই দেখতে। নরম। আশ্চর্য সুন্দর কবিতা।

হঠাৎ কেন যে ভাবল, লোকটার মাথায় কি সত্যব্রতের ভূত চেপেছে!

লোকটা তখন বলল, তুমি কিছু খাবে?

এবং এটাই নিয়ম— যারা হোটেলে থাকতে একা নিঃসঙ্গ বোধ করে এবং রাতের সঙ্গিনী চায় তাদের কাছে এর চেয়ে বেশি হৈমন্তির আশা থাকে না।

ভাবেসাবে হৈমন্তি বুঝল, লোকটা সহজে মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। বরং পটু রিঙমাস্টারের মতো অনেকক্ষণ তাকে নিয়ে খেলবে। এ-সব ক্ষেত্রে তার নিজের অভিরুচির চেয়ে লোকটার অভিরুচির কথাই বেশি ভাবতে হয়।

এবং সে জানে যত এই লোকটাকে খুশি করতে পারবে তত তার বেশি

পাস মার্ক।
হৈমন্তি বলল, আপনি খাবেন তো? ঠিক পরিবারের কোনও আত্মীয় যেন তার সঙ্গে কথা বলছে।
তুমি খেলে, খাব।
হৈমন্তি বুঝল, লোকটি মেয়েছেলে পটাতে ওস্তাদ। সে খেলেই খাবে। সে না খেলে খাবে না— নারীর জন্য তার যেন ভালবাসার শেষ নেই।
যেন সে এখানে প্রবাসে আসেনি। অথবা হয়তো মানুষটার কথাবার্তা খুব সাধাসিধে।
সত্যব্রতও ঠিক এ-ভাবে কথা বলত।
কিছু আনো, দু'জনে খাই।
সে বোঝে মানুষের স্বভাব এক এক রকমের— যদিও শেষ ইচ্ছে কী জানে। অন্তত সত্যব্রতর বেলায় সে হাড়ে হাড়ে এটা টের পেয়েছে।
লোকটাকে সহৃদয় মানুষ বলেই সে ভাবল।
অন্তত সত্যব্রতের মৃত্যুর পর সত্যব্রতের মতো কথা কেউ তাকে বলেনি!
এখনও তুমি খাওনি সুরমা। আমার জন্য বসে আছো। আমায় তো ফিরতে দেরি হয় তুমি জানো।
তবু হৈমন্তির লোকটার জন্য এক ধরনের দুঃখবোধ তৈরি হল। মেলা টাকা না থাকলে এই হোটেলের বোর্ডার হওয়া যায় না সে জানে— এই বিলাসবহুল ঘরে রাত্রিবাসে সব আছে— একা থাকলে, সঙ্গিনী চাইতেই পারে। এবং কিছুটা ছিমছাম গড়নের, কিছুটা সাধু-প্রকৃতির চোখমুখ, হয়তো পরিবারের কিংবা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এত সুনাম আছে যেন নারী নিয়ে মানুষটায় এই রাত্রিবাস— কিছুটা আকস্মিক ঘটনা।
লোকটা বলল, এত দেরি করলে কেন?
হৈমন্তির একটু দেরি হয়েছে— ঠিকই।
সে বলল, শহরে প্রধানমন্ত্রী দিল্লি থেকে আসছেন— সারা রাস্তায় ব্যারিকেড। গাড়ি ঘুরিয়ে দিতে হল। সারা রাস্তায় জ্যাম। দেরি হয়ে গেল। সে যে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল চিরকুটের আশায় তা বেমালুম এড়িয়ে গেল।
সে যে শিয়ালদহ থেকে হেঁটে এসেছে, তার যে গাড়ি কিংবা ট্যাক্সি চড়ার মুরদ নেই, বেমালুম মিছে কথা বলে ক্লায়েন্টের কাছে আভিজাত্য প্রমাণের কিছু নমুনা যেন রেখে দিল।
সেই কখন থেকে তোমার আশায় বসে আছি।
আমার আশায় কেন? আমি যে আসবই তেমনতো কথা ছিল না।
তবু কেন যে মনে হল তোমার মতো নারীর সঙ্গ দরকার ছিল আমার। আমি পামেলাকে বললাম, রুচিবোধ আছে এমন মেয়ে পাঠাবে।
এ-লাইনে কি রুচিবোধ থাকতে পারে স্যার।
এই প্রথম হৈমন্তি তাকে স্যার বলে সম্বোধন করল।
এখন সে নেই, লোকটাও নেই তিনি হয়ে গেছেন।
তিনি এবার চশমাটা খুলে রাখলেন টেবিলে। বললেন, আগে তোমার কী নাম বলো!
সুরমা ছোট্ট করে বলল, হৈমন্তি। আপনাকে আমার নাম আগেও বলেছি। তিনি বললেন হৈমন্তি তো নাম। সঙ্গে আর কিছু নেই!
এবারে সুরমা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। কেউ কেউ নাম জানতে চায়। কেউ কেউ কিছুই চায় না। শুধু শরীর চায়।
তাঁর আবদার রক্ষার্থে সুরমা বলল, নাম আমাদের বলতে হয় না। বলার নিয়ম নয়। তবে আপনি অন্যরকমের মানুষ। আমার নাম হৈমন্তি মুখার্জি।
সুরমা তার নামও বলল না, পদবীও ঠিক বলল না। এখানে এলে সবই কুহেলিকা ভাবতে হয়। এ-সব জায়গায় সে যখন যেমন ইচ্ছে বলে থাকে। আজকাল এখানে তার হৈমন্তি নামটাই চালু। এবং এই চার তারা হোটেলে-এর বাবুর্চিরা জানে তার নাম হৈমন্তি। সে যে সত্যব্রতের স্ত্রী সুরমা, বাণীব্রত বলে একজন পুত্রও আছে তার— সব অস্বীকার করে হৈমন্তি নামটাই চালু রেখেছে। অবশ্য তারা তাকে মেমসাব বলেই ডাকে কারণ কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলে। বয় বাবুর্চিরা যায় কোথায়!
এনকোয়ারি কাউন্টারে বেঁটে বয়স্ক চক্রবর্তীবাবু তাকে বলেছিল, তোমার চেহারার সঙ্গে হৈমন্তি নামটা খুব মানায়। তোমার কি কোনও বিষাদ থাকে না?
বিষাদ মানে।
এই দুঃখ দুশ্চিন্তা থাকে না। সব সময় যেন হাসিটুকু তোমার মুখে ফুটে থাকে। আশ্চর্য কুয়াশায় স্নিগ্ধ গোলাপের মতো। লোকটা একসময় কবিতা টবিতা লিখত বোধ হয়। কারণ, সবাই কবিতা লিখতে চায়। কবিতা লিখতে লিখতে চক্রবর্তীবাবু হয়ে যায়। পামেলা হায়দার হয়ে যায়, সুরমা হৈমন্তি হয়ে যায়।
হৈমন্তি ফিক করে হাসল। চক্রবর্তীবাবুর স্ত্রী কোনও এক নব হালদারের সঙ্গে পলাতকা। চক্রবর্তীবাবুর একগণ্ডার উপর ছেলেমেয়ে। কাজের লোক রাখেন না— সব নাকি তার চুরি যায়— আরে বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে থাকলে কত সুবিধা! হারকিপটে মানুষ হলে যা হয়।
সেই কাটখোট্টা চক্রবর্তীবাবুই বলেছিলেন, তোমার চোখ হেমন্তের আকাশের মতো স্বচ্ছ এবং এটা চাটুকারিতা কি না হৈমন্তি জানে না।
কোনও কোনওদিন ক্লায়েন্ট না থাকলে চক্রবর্তীবাবু তাকে পাশে বসিয়ে রাখতে ভালবাসে। সার্ভিস রুমে ফোন করে খাবার আনিয়ে খাওয়ায়। সামান্য ফস্টিনষ্টি করে। এখানে সেখানে হাত দিয়ে মজা পায়। ওই পর্যন্তই— আর বেশিদূর যায় না।
চক্রবর্তীবাবু কখনও কখনও জমপেশ করে তার স্ত্রীর গল্পও করে।
যেমন বলে, চলে গেল ঠিক, তবে ভুলতে পারি না। সেও ভুলতে পারে না। মাঝে মাঝে আসে। ছেলেদেরও খোঁজ খবর নেয়— পলাতকা হয়ে বেশিদিন থাকতে পারেনি। সংসারের টানে না এসে পারে না— কী করবে! ছোট মেয়েটা তো খুবই কচি। তার টানেই আসে। মা এসেছে, মা এসেছে— নৃত্য শুরু করে দেয়। কখনও কাঁদে— অগত্যা বউ তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যায়।
হঠাৎ বলে উঠে, আচ্ছা আমার শরীরে কি কোনও ভাল্লুকের মতো ভোটকা গন্ধ আছে হৈমন্তি— তুমি বুঝবে না আমারও দিন ছিল, স্পোর্টিং ইউনিয়নের হাফ-ব্যাকে খেলি— আমি একটা শিরোপাও পেয়েছিলাম, দর্শকরা আমাকে চিনের দেওয়াল ভাবত। ঘরে কত কাপ মেডেল— বউ নীলা আমার গুরুত্বই উপলব্ধি করতে পারল না!
হৈমন্তি হেসে বলত, আপনার শরীরে ভাল্লুকের গন্ধ।— কী বিশ্রী চিন্তা বলুন। কোনও গন্ধই নেই।
তা হতে পারে। বউটা আমার শরীরের কোনও ঘ্রাণই পেল না।
একদিন না পেরে হৈমন্তি বলেছিল, ঘ্রাণ না পেলে গণ্ডাখানেক বাচ্চা হয় কী করে!
চক্রবর্তীবাবু হাই তুলে বলেছিলেন— সেই।
চক্রবর্তীবাবু গল্প করে যায় আর হৈমন্তি বিকেলে এসে গল্প করে। কারণ, কিছু উপার্জন বাড়তি যদি হয়— এই আশায়। তখন মেয়েদের ভিড় থাকে না— হৈমন্তি ক্লায়েন্টের আশায় বসে থাকে চুপচাপ। কখনও করিডর ধরে এদিক ওদিক তাকায়। কোনও ফোন এলে ভাবে এবার বুঝি তার পালা।
সেই চক্রবর্তীবাবু বলেছিলেন, তোমার কদর বাড়ছে হৈমন্তি। কখনও কোনও সাবসুবো লোক, নাম ধরেই বলে, হৈমন্তি আছে? চক্রবর্তীবাবু বলে, হৈমন্তি এনগেজড। অথবা তার সঙ্গে কখনও কোনওবারও রাত্রিবাস ঘটেছে— পরে এলে তারই খোঁজখবর নিয়েছে। একবার এক মাদ্রাজি সাব বলেছিল, নো হৈমন্তি নো প্লেজার।
চক্রবর্তীবাবু যে তাকে কত রকমের খবর দেন।

হৈমন্তি বুঝতে পারছে না, তাঁকে স্যার বলা উচিত হয়েছে কি না।
কী-ভাবছ এত হৈমন্তি! তিনি প্রশ্ন করলেন।
কিছু না।
তিনি ফের উৎকণ্ঠায় বললেন, আমার কোনও ফোন এলে কিন্তু তুমি ধরবে না।
আমি ফোন ধরব কেন? আমাকে কে আর ফোন করবে। আমি তো আপনার সঙ্গে এনগেজড। এনকোয়ারিতে যারা আছেন, তারা তো জানে, হৈমন্তি এখন কোন ঘরে, কার কাছে। তারা শুধু বলবে, হৈমন্তি নেই। অথবা বলবে— সে এনগেজড।
টেবিলে কিছু ম্যাগাজিন, কিছু পর্ণগ্রাফি। টেবিলে এমন সব ম্যাগাজিনই থাকার কথা। তিনি, ঘর বুক করার আগেই ছিল, এখনও আছে। এই মধ্যবয়সি মানুষটির সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখে হৈমন্তির এমনই মনে হল।
রিন রিন করে সাউন্ডবক্সে ভেনচারসের মিউজিক বাজছে। দুটো খাট। সাদা বিছানা। কাচের বড় দেয়াল রাস্তার দিকে। সিল্কের পরদা এ-মাথা ও-মাথা টানা। কিছুটা ফাঁক রয়েছে। তারই ফাঁকে আকাশ এবং রাতের কলকাতা ফুটে উঠছে ক্রমশ।
ডানদিকে জাতির পিতা দেওয়ালে ছবি হয়ে আছে—এবং যেন হৈমন্তিকে দেখছে।
সব ঘরে থাকে না। কাস্টমারদের নির্দেশেই এটা হয়। যাঁর যেমন পছন্দ।

ছবিটা থেকেই গেছে।
এই ঘরটা কারও ব্যক্তিগত ঘরও হতে পারে। দেশ বিদেশ থেকে বিচিত্র রকমের মানুষ যে এই ঘরে থেকে গেছে বোঝা যায়। ডাবল খাটের ব্যবস্থা থাকায় হৈমন্তির মনে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী হতে পারে। আবার বান্ধবীকে নিয়ে এলেও এমন একখানা সুটের দরকার হয়। খুব যে এলেমদার ক্লায়েন্ট মানুষটিকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না হৈমন্তির।
তিনি বললেন, তুমি একেবারে দেখছি কুলীন বামুন।
তিনি তার সঙ্গে এই প্রথম বাংলায় কথা বললেন। তিনি যে বাঙালি এটাও তার বুঝতে অসুবিধা হল না।
মুশকিল হচ্ছে এমন একজন সম্ভ্রান্ত মানুষকে আপনি আজ্ঞে করলে যেন মানায়। স্যর বলতে পারে— মিস্টারও বলতে পারে— আর যাই হোক বাবু বলে সম্বোধন করা যায় না।
এইসব কারণে সে অস্বস্তিতে আছে। বারবণিতার পক্ষে যা শোভন সে তার আচরণে এই মুহূর্তে ফুটিয়ে তুলতে কেন যে দ্বিধাবোধ করছে।
হৈমন্তিকে সামান্য অধীর দেখাল। কতক্ষণ তাকে নিয়ে সময় কাটাবে তাও সে বুঝতে পারছে না। তার এখন একমাত্র কাজ মানুষটাকে শরীরের ভাঁজগুলো দেখানো। সে তার আঁচল কিছুটা সরিয়ে নিজেকে উদ্ভাসিত করতে গিয়ে থমকে গেল।
সে আঁচল টেনে দিল।
তুমি হৈমন্তি আমার সঙ্গে যাবে তো?
সে বলল, কোথায়!
হৈমন্তি ভাবল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারলে বাণীব্রতকে কাছে পাবে। স্নান করে তাকে আদর করতে পারলে, তার আর গ্লানি থাকে না। সে স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।
হৈমন্তি কী যে বলে।
মানুষটি তাকে আর কিছু বলছে না। কেমন থম মেরে বসে আছে।
তারপর কী ভেবে বলল, এই নদীর পাড়ে— কিংবা অন্য কোথাও— তোমার উষ্ণ হাত দু'হাতে জড়িয়ে বসে থাকব।
সে বলল, সে হবে।
কিন্তু যা হয়, এঁদের খুশি করতে না পারলে পামেলা হায়দার ক্ষেপে যাবে। তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। লাইনে এসেছ— শরীর নিয়ে এত শুচিবায়ু থাকলে হয়!
তার সুনাম নষ্ট হবে। তার একমাত্র কাজ এখন শরীর থেকে সায়া ব্লাউজ শাড়ি খুলে ফেলা। বোকার মতো সেজন্য তার এত সময় নষ্ট হয়। এখনও সে ততটা বেহায়া হতে শেখেনি। পামেলার প্রায়ই অভিযোগ। আরও চটপটে হতে হবে। পার্শি, পাঞ্জাবি, কেরলের মেয়েরাও আসে— ওরা কত চটপটে দ্যাখ, তারা যায় আর আসে। সবই চক্রবর্তীবাবুর রিক্রুট।
পামেলা হায়দার বলে রিসেপশনিস্ট, উঁচু লম্বা মেয়েটা তাকে গালগাল দেয়— এত সময় লাগে কেন!
সে তখন কী বলবে— সবাই তো একরকমের হয় না, পামেলাদি। প্রায় সময়েই ঘণ্টা মিনিটের হিসাব ঠিক থাকে না। কখনও কখনও রাত্রিবাসেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
এ-জন্য আলাদা বাড়তি খুব যে কিছু একটা পাওয়া যায় তাও না। তবু দয়া করে ক্লায়েন্ট যদি আলাদা কিছু ধরিয়ে দেয় সেটা উপরি পাওনা। তাদের টাকা পয়সা পামেলা হায়দারের জিম্মায় থাকে? নেমে এলে টাকা পয়সা বুঝিয়ে দেবার কাজ পামেলার।
পামেলা হায়দারের এক কথা, আরে ওটুকু খসিয়ে দিতে এত সময় লাগে! তুমি কী!
এক রাতে দু' তিনটে খদ্দের সামলাতে না পারলে তোমার চলবে কী করে!
হৈমন্তি পারে না।
তার তখন কেন যে বমি পায়।
পামেলার এক কথা, পুরুষ মানুষের ভেতরে যতক্ষণ ওটা থাকে ততক্ষণই ভাব ভালবাসা। ছাড়তে চাইবে না। ক্ষিদেটা চাগিয়ে দাও, চোখ মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে যাক— দেখবে সে ঝাপিয়ে পড়ছে। ঝাপিয়ে পড়লেই কিছুক্ষণের দাপাদাপি। হয়ে গেলে দেখবে বেড়াল ছানার মতো কুঁই কুঁই করছে। তুমি থাকলে কী থাকলে না তার কিচ্ছু যায় আসে না।
পামেলা খুব সুন্দর করে অশ্লীল কথা বলে। তার মুখে আটকায় না।
লোকটা ততক্ষণে সার্ভিস রুমে ফোন করে খাবার এবং মদ দুই আনিয়েছে। বেয়ারা সব রেখে গেলে মানুষটা নিজেই পরিপাটি করে বসল। গেলাসে মদ ঢালল। তারপর গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে দেখল। তারপর হৈমন্তির গ্লাসটাও চোখের সামনে তুলে দেখল। পরিমিত পরিমাণ কতটা তিনি জানেন, হতাশায় ডুবে গেলে, তিনি বাড়িতেও যে মাঝে মাঝে মদ্যপান করে থাকেন, আবার নিয়মিতও খেতে পারেন হৈমন্তি তার সেইসব বৃত্তান্ত কিছুই জানে না।
আর এইসব রাত্রিবাসে সুরা না হলে যে জমে না এমনও ভেবে থাকতে পারেন তিনি।
সঙ্গে ভাজা মুরগির মাংস— চিলি চিকেন। সামান্য লঙ্কার সস।
তিনি বললেন, চিয়ার্স।
হৈমন্তি গ্লাসে গ্লাস ঠুকলে তিনি বললেন, চিয়ার্স।
হৈমন্তি এবার আর একটু আলগা করে দিল বুকের আঁচল।
সে ভেবেই পাচ্ছে না তাকে কী বলে সম্বোধন করবে।
তখনই তিনি বললেন, স্যর স্যর করবে না। আমি তোমার কাছের মানুষ হতে চাই।
তার বড়দার বয়সি লোকটা।
সে বলল, আপনাকে মিস্টার বললে রাগ করবেন।
মিস্টার কেন?
আর কিছু নেই!
আর আছে বাবু।
তুমি আমাকে বাবু বলেই ডাকবে।
বাবু, একটু তাড়াতাড়ি করলে হয় না।
আচ্ছা হৈমন্তি তাড়াতাড়ি খাওয়া যায়।
রসিয়ে খেতে হলে একটু সময় তো লাগবেই। এই হোটেলের চিলি চিকেন দারুণ সুস্বাদু এমন শুনেছি। আস্তে আস্তে খাও আরাম পাবে।
তারপরই বললেন, তোমার এই সুন্দর নিষ্পাপ মুখখানা বড়ই পবিত্র। তুমি কখনও রেগে যাও না। রেগে গেলে কেমন দেখায়, ইচ্ছা করে দেখতে। কী হল হাতে নিয়ে বসেই আছ। খাও। এক চুমুকে খাবে না। আস্তে আস্তে খাবে। না হলে বিষম খাবে বলে দিলাম।
হৈমন্তি এক ঢোকেই মেরে দিল।
আরে করছ কী! তোমার কি খাওয়ায় অভ্যাস নেই। তুমি দেখছি জানোই না কী করে খেতে হয়।
সামান্য হেচকি দেখা দিলে বাবু তার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন তুমি কী সুন্দর। আর নরম।
বাবুদের কী করে সামলাতে হয় হৈমন্তি জানে। সে মাথা থেকে হাত নামিয়ে বলল, আমার কিচ্ছু হবে না।
কিছু হবে না বললে তো চলবে না! তুমি ছেলেমানুষ।
এই কথায় হৈমন্তি হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। তার স্বামী সত্যব্রত যে কতভাবে উপভোগ করত তাকে— চিত হয়ে শোও, পাশ ফিরে শোও, পা দুটো মেলে দাও, আমার উপরে উঠে বসো।
একই ভাবে এই বারবণিতা কৈশোর থেকেই রপ্ত হয়েছে সংলগ্ন হওয়ার বিষয়গুলি। এবং মধুপুরে—
ভালবাসার দিনগুলি তার মনে পড়ছে। সে ছিল সত্যব্রতের কবিতার ফ্যান। এক কবিতা পাঠের আসরে আলাপ। সত্যব্রত তাকে কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছে— তোমার শরীর আমাকে মুগ্ধ করে, সুরমাকে বলেছিল। সুরমাকে নিয়ে রিকশায় ঘুরে বেড়িয়েছে— আর বলেছে, এই জ্যোৎস্না আর নিশিথের নিস্তব্ধতা সার করে তোমাকে চিনেছি সুরমা। আমার রক্তেকোষে ঝড়, আর দগ্ধ যৌবন নিয়ে অহরহ তোমাকে খুঁজি। শরীর ব্যবহারের আগে সত্যব্রত আদর করার সময় তার মধ্যে বীজধান পুঁতে দিত এ-ভাবে। সেই শিহরণ আর সে অনুভব করে না। শিহরণে যে মাতাল হয়ে যেতে হয়, তারপর রাতে—
মনে আছে সার্কিট-হাউজের একটা ঘরে সে ছিল একা— দেওয়ালের ওপাশে বিশাল শিরিষ গাছের অন্ধকার, তারও কবিতা পাঠ ছিল— কারণ সত্যব্রত তার সুবিধার জন্য সুরমাকে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করত— কবি না হলে সত্যব্রত তাকে দূরে কোথাও নিয়ে যেতে পারে না— অজুহাত যে কতরকমের হয়— তার আমন্ত্রণের সঙ্গে সুরমার নামেও একটা চিঠি থাকত। এবং সঙ্গে সুরমা আছে।
জেলার কবিদের অনুষ্ঠান, সারাদিন 'সূর্য হলে' কবিতা পাঠের আসর— এবং সেই শহর সংলগ্ন সার্কিট-হাউজে নিশিযাপনের ব্যবস্থা, সত্যব্রত মধ্যমণি হয়ে যেত সেই কবিতা পাঠের আসরে— এই সেই সুরমার জন্য একটি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছে, অন্য কবিরা আছে এই সারকিট হাউজেরই নানা অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে— খুশি করার জন্য কবিরা কেউ কেউ সত্যব্রতের

প্রিয় লিকারও নিয়ে এসেছেন— এবং সেই রাতে শিরিষ গাছের ডালে পাতায় তখনও অন্ধকার ছিল, জোনাকিপোকা জ্বলছে, পাশে নদীর জলে তরঙ্গ, নদীর পাড়ে বাবলা বন এবং সারকিট হাউজের সামনে ঝাউগাছ, তার সামনে এক বিশাল প্রান্তর পড়ে আছে। রাস্তায় গ্যাসবাতি জ্বলছে— শোওয়ার আগে সুরমা জানালায় বসে, এই সব দেখতে দেখতে জীবনের নিরবধি অধিকার নিয়ে যখন ভাবছিল, তখনই দরজায় টোকা।

কে?

আমি।

আমি কে?

সত্যব্রত

তুমি কি মাতাল হয়ে আছ?

না সুরমা!

সুরমা দরজা খুলে দিলে দেখল, সত্যি সে মাতাল হয়নি— মাতাল হওয়ার অবশ্য তার কারণও ছিল না— মদের আসরে সে প্রকৃতই সেদিন লিকার স্পর্শ করেনি— অনুজেরা খাবার আগে বলছে, দাদা তোমার পারমিশনে খাচ্ছি— মাতাল হলে পরে দোষ দিও না।

সুরমা কি আশা করেছিল সে আসবে।

সত্যব্রত তাকে জড়িয়ে ধরলে সে বাধা দেয়নি।

সুরমা বলেছিল, বেশিদূর না কিন্তু।

না না, তোমার ভবিষ্যত আছে না।

'বেশিদূর না' অবশ্য শেষপর্যন্ত রক্ষা হয়নি।

সুরমাও সংলগ্ন হয়ে তার শরীর নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। জংঘার দু-পাশে চালতা কষের মতো এক স্রোতধারা নেমে আসছে— উত্তেজিত হলে এটা হয় আগেও সে টের পেয়েছে, যদি হাত দিয়ে সত্যব্রত তা টের পায়, এইসব ভেবেই দু-জংঘার মাঝখানে হাত চেপে রেখেছে, তবু কেন সত্যব্রতর স্পর্শ পাওয়া মাত্র তার হাত যে শিথিল হয়ে গেল, এবং অবশ হয়ে গেল— আর সত্যব্রত সেই যে ভিতরে প্রবেশের অধিকার পেয়ে গেছিল— কারণ, দু'জনেরই মিলনে ছিল বিচিত্র উল্লাস এবং একাত্মময়। যখন টের পেল সুরমা তখন জননী হয়ে গেছে। সে জানাল সত্যব্রত।

সম্মান রক্ষার্থে সত্যব্রত রেজিস্ট্রি করে ফেলল। সেই কাগজ তার কাছে আর নেই। সত্যব্রতের মৃত্যুর পর সে খোঁজও করেনি। বাণীব্রত তখন মায়ের হাত ধরে স্কুলবাসে উঠে যায়। সে তার পুত্রকে বাসে তুলে দিয়ে আসে। সেই কাগজেরই বা মূল্য কী! তার টাকার দরকার। বাণীব্রতকে নিয়ে বাঁচতে হবে।

সুরমা একা। আর বাণীব্রত। আত্মীয়স্বজনেরা কবেই দূরে সরে গেছে। সত্যব্রতের সঙ্গে তার মেলামেশা আত্মীস্বজনদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। বন্ধন বলতে বাণীব্রত।

ঘোর অন্ধকার থেকে আত্মরক্ষার তার আর কোনও উপায় ছিল না। একমাত্র ভুজঙ্গ ছিল সঙ্গে সেও বিয়ে করার পর আর সময় দিতে পারত না। অভাব অনটন চারিদিকে ব্যপ্ত হয়ে আছে—

কী হল, তুমি খাচ্ছ না কেন হৈমন্তি— কী যেন ভাবছ! আমি কি কোনও কষ্ট দিয়েছি তোমাকে! তারপরই কী চোখে পড়তেই তিনি আঁচল দিয়ে হৈমন্তির শরীর ঢেকে দিলেন।

তারপর আর যেন কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। এক সিপ খেয়ে সিগারেট ধরালেন।

তারপর ধোঁয়া ছাড়লেন।

তারপরই সহসা ছুটে গিয়ে ফোন তুলে নিলেন।

হ্যালো। গভর্নর হাউজ। হ্যালো— হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রেস-এটাচি! সকাল নটায়। আচ্ছা।

তারপর তিনি ফোন যথাস্থানে রেখে তার পাশে এসে বসলেন।

হৈমন্তি কোথায়, কী ফোন, কার ফোন, কেন ফোন কিছুই জানতে চাইল না হৈমন্তি। তার পা মানুষটা দেখুক— সে কিছুটা শাড়ি তুলে পাটা এগিয়ে দিল, এবং চোখে কিছুটা আর্তি ফুটিয়ে তুলল।

তিনি তার দিকে তাকাচ্ছেন না। শাড়ি আলগা করেও কিছু হচ্ছে না।

তিনি একটা নোটবুকে শর্টহ্যান্ডে কিছু নিবিষ্ট হয়ে লিখছেন।

ফোনে শুধু পরে দু-বার বলেছেন, তারমধ্যে একটা কথা, এনি চেঞ্জ, আর একটা কথা, প্রাইম মিনিস্টার স্পিচ। ইন্দিরা কী বললেন।

হৈমন্তি বাধ্য হয়ে মানুষটার পাশে গিয়ে গা ঠেকিয়ে বসল। যদি তাড়াতাড়ি কিছু হয়।

তিনি হৈমন্তির লাইনে আসছেনই না। তিনি শুধু বললেন, হৈমন্তি তোমার নামটা ভারী সুন্দর।

চশমার ভিতর দিয়ে হৈমন্তিকে একবার দেখার চেষ্টা করলেন। হৈমন্তি মাথাটা এলিয়ে দিল। তাঁর কাঁধে মাথা রাখল।

হৈমন্তি কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে বসেই আছে।

তিনি বললেন, কাঁধে মাথা রাখলে পেট ভরবে! খাও।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

তবে কী ইচ্ছে করছে।

সে বলতে পারল না, বাবু আপনাকে নিয়ে আমি শুতে চাই। এই শব্দখানা মানুষটার মনে যদি অশ্লীলতা তৈরি করে, তবে সে ছোট হয়ে যাবে।

তিনি এমন কথা পছন্দ নাও করতে পারেন।

হৈমন্তি এবার রুষ্ট গলায় বলল, আপনি কতক্ষণ ধরে খাবেন?

কতক্ষণ ধরে! তা কিন্তু বলতে পারব না।

তবে কী বলতে পারবেন?

তুমি এত সুন্দর, তোমাকে এ-লাইনে মানায় না।

ও-সব বড় বড় কথা বাবু অনেক শুনেছি।

শোনো হৈমন্তি তুমি নিজেকে এত অপরাধী ভাবছ কেন? তুমি যা, তাই বললাম। সুন্দরকে সুন্দর বলতে হয় জানো। না হলে তাকে অপমান করা হয়।

সুন্দরকে সুন্দর।

হ্যাঁ সুন্দরকে সুন্দর। তুমি কি কুৎসিত ভাবো নিজেকে। আর তখন ক্ষেপে গিয়ে বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন, বাইরে বের হয়ে কী কথা হল হৈমন্তি টের পায়নি—

এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বেয়ারা একটি গোলাপগুচ্ছ নিয়ে ঢুকলে হৈমন্তি অবাক হয়ে গেল। বেয়ারাকে তিনি বকশিস দিলেন, এবং বেয়ারা চলে গেলে গোলাপগুচ্ছটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, তোমার জন্য এনেছি। সুন্দরকে সুন্দর বলে তোমাকে অপমান করতে চাইনি।

আপনার ঘুম পায় না! গোলাপফুল দিয়ে কী হবে! মিছিমিছি এতগুলি টাকা নষ্ট করলেন! আপনি কী!

ধরে নাও আমি একজন হতভাগা মানুষ। দুর্ভাগাও বলতে পার।

দুর্ভাগা বলছেন কেন?

দুর্ভাগা না হলে আমি তোমার দরজায় হাজির হব কেন বল!

এত বিনয় ভাল না বাবু।

কোনও কিছুই ভাল নয়। মানুষের যত ভাল করবে, তত ঠকবে।

হৈমন্তি বলল, মানুষের ভালটা কি আপনি বোঝেন।

না বুঝি না।

হৈমন্তি বলল, মানুষ নিজেকে ছাড়া কিছু বোঝে না। আত্মত্যাগ বলুন, আত্মহত্যা বলুন, সবই সে নিজের ইচ্ছেতে করে।

কি হল খাও। হৈমন্তি তোমার কি খেতেও ইচ্ছে করছে না।

হৈমন্তি এক টুকরো মাংস মুখে নিয়ে চিবুতে থাকলে বলল, সস্ নাও, সসে ভিজিয়ে খাও।

বাবু আপনার কি ঘুম পাচ্ছে!

কেন এ-কথা বলছ।

না, আপনি ঝিমোচ্ছেন বলে বললাম।

আমি ভাবছি। ঝিমোচ্ছি না।

কী ভাবছেন!

তোমাকে।

মিছে কথা।

মানুষটা কেমন সরল হয়ে যাচ্ছে।

আমাকে ভাবার কী আছে। আমি তো তৈরি হয়ে আছি।

আচ্ছা আত্মহত্যা কত প্রকারের হতে পারে?

আত্মহত্যার কথা উঠছে কেন?

আরে এমন আত্মহত্যা যা অনুভব করা যায় না। মরে যাবে, কিন্তু টের পাবে না— তোমার কি কিছু জানা আছে। এই ধর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া যায়। এই ধর বিষ খেয়ে কিংবা জলে ডুবে, চলন্ত ট্রেনের নীচে ঝাঁপ আরও অজস্র ফিলিমের আত্মহত্যার প্রকরণ এত যে ভেবে কূল কিনারা পাওয়া যায় না—

আপনি কি মনে করেন, এই যে অন্য নারী গমন তাকে কি আত্মহত্যা ভাবেন।

তোমাকে মেয়ে সোজাসুজি বলেই দিই, আমি একজন ব্যর্থ মানুষ, অথচ দ্যাখো কলকাতায় আমার বিশাল বাড়ি আছে। গ্যারেজে গাড়ি আছে, কয়েকটি ফ্ল্যাটও ছেলে মেয়েদের নামে নামে কেনা আছে। পরিবার পরিজনদের

সুখের জন্য, ভাই বোনদের অভাব থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছি। কিন্তু কেউ খুশি নয় আমার উপর। তারা আরও চায়। কী করা যায় বলত!

তারা খুশি না।

আপনি সব বন্ধ করে দিলেই পারেন।

পারি।

কিন্তু দৈব, তার কী উপায় হবে।

দৈব আসছে কোথা থেকে।

তিনি হাসলেন। করুণ এবং অতীব ক্লেশ ফুটে উঠল তাঁর মুখে। আমার মুশকিল কি জান হৈমন্তি, এমনিতেই আমার পেটে কথা থাকে না, একটু লিকার খেলেই, পৃথিবীর সবাইকে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে— ওরা আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে।

ব্ল্যাকমেল কেন।

আমার প্রথমা কন্যা অরুন্ধতী, জানো।

আমি জানব কী করে!

বিদূষী সুন্দরী, সরল এবং কী ভাল মেয়ে— স্বামীকে পাগলের মতো ভালবাসে। লোকটি সরকারি বড় পোস্টে কাজ করে। গাড়ি বাড়ি সব আছে— কোনও অভাব নেই। অথচ মারধোর করে, অজস্র অত্যাচারে মেয়েটা আমার কী হয়ে গেল। পার্সোনালিটি লস্ট বোঝ।

বুঝব না কেন।

আজকে সকালে তাকে অ্যাসাইলামে রেখে এলাম। আমার বুকটা খাঁ খাঁ করছে। কোথায় যাই, কেন যে শেষে এখানে।

এটাতো নারী নির্যাতনের মামলা— আপনি ছেড়ে দিলেন কেন।

আমার মেয়ে। না বাবা তুমি কিছু করতে যেও না।

লোকটি কি লম্পট!

তিনি চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, লম্পটদেরও একটা চরিত্র থাকে। তার তাও নেই। নৃশংস বলতে পার। বাড়িতে আর ফিরতে ইচ্ছে করেনি— এখানে চলে এসেছি।

আপনার স্ত্রী।

অসুস্থ। পালিত পুত্রই সব করে— নার্স, ওষুধ, মায়ের যতরকমের সেবা সেই করে— সে আছে বলেই আত্মহত্যায় পুত্রের প্রতি অবিচার করতে পারছি না।

তারপরই তিনি কেমন লজ্জায় পড়ে গেলেন। সংসারে নানা ধর্ম-অধর্ম দুই থাকে। তাঁর যেমন মনে হয়েছে, কিছুদিন সে সবার আড়ালে বসবাস করবে।

তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা প্রয়োজনে আসে, তিনি হারিয়ে গেলে এবার তার কোনও খোঁজও নেবে না। শুধু পালিত পুত্র অপেক্ষা করবে। আর কেউ না।

আমি সুনিশ্চিত, খবরের কাগজ সব সে সামলাবে। তবে তিনি তাকে আশ্বস্ত করেছেন, আমি নাও ফিরতে পারি। না ফিরলে চিন্তা করবে না। কোথাও রওনা হয়েছি ফের— কোথায় যাওয়া যায় দেখি। অরুন্ধতী আমাকে শেষ করে দিয়েছে। তোমার দিদির কথা ভাবলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। একজন কপর্দকশূন্য মানুষের সব সাফল্য আজ অর্থহীন। তোমার মাও যে আজ এত অসুস্থ, শুধু অরুন্ধতীর কথা ভেবে।

তাঁর গঞ্জনাও আমার সহ্য হচ্ছিল না। তুমিই এই সর্বনাশের জন্য দায়ি। পরিবারটির কোনও খবর নিলে না।

এরপর আমার বেঁচে থাকাও মাঝে মাঝে অর্থহীন মনে হয়। তবে আমি মনে করি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব থাকে না। এগুলো কাপুরুষের লক্ষণ। কোথাও ঘুরে ফিরে মন শান্ত হলে বাড়ি ফিরব।

থানা পুলিশ করতে যেও না।

কি ব্যাপার, থম মেরে বসে আছেন। জীবন এ-রকমেরই। খান।

খাচ্ছি তো।

খাচ্ছেন— তবে খাবার মুখে দিচ্ছেন না। শুধু লিকার গিলছেন। ফ্রায়েডরাইস রেখে গেছে— নিন খান। প্লেট এগিয়ে দিল হৈমন্তি। এই যে দেখুন, আপনার গোলাপ ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে বসে আছি। আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনার এই উপহার আমার মনে থাকবে।

হৈমন্তির কথায় তিনি এক টুকরো মুরগির ঠ্যাং চিবুতে থাকলেন। কারণ, তার উপহারের সে মূল্য দিয়েছে। জীবনে তো তিনি এটাই চেয়েছেন। ভিতরের ক্লেশ যেন তাঁর অনেকটা লাঘব হয়েছে।

তুমি কিছু মনে কর না, আমার এই হয়, একটু পেটে পড়লেই উচিত অনুচিতের কথা মনে থাকে না। নিজের কষ্টের কথা না বলতে পারলেই ভাল হত। আমার যা চরিত্র, তারা না থাকলে আমি শূন্য হয়ে যাব।

আপনি খাবেন। না শুধুই কথা বলবেন। আমাকে ফিরতে হবে না! বাড়িতে আমার শিশুপুত্র— সে তো অপেক্ষা করে আছে।

তোমার ছেলে আছে?

থাকবে না!

তিনি কী করেন। মানে তোমার স্বামী।

তিনি নেই! তিনি কবিতা চর্চা করতেন।

কবি তিনি!

আজ্ঞে।

আমিও তো কবিতা চর্চা করেছি। কী নাম তাঁর।

বলব না।

বলবে না কেন?

আমাদের নিয়ম নেই।

নিয়ম নেই মানে।

ঠিকুজি কুষ্ঠি কাউকে দিতে নেই। আমি আপনার নাম জানতে চেয়েছি! আপনি কে, কী করেন জানতে চেয়েছি? আমরা এক পান্থশালার নারী পুরুষ। পথেই দেখা, পথেই পরিচয়। তারপর সব ভুলে যাওয়া।

শোনো হৈমন্তি আমার কোনও গোপনীয়তা নেই। দেখলে তো আমার পেট খোলসা হয়ে গেল— কেন যে হয়। তুমি আমার কে বল! তোমাকে বলে আমার লাভ কী বল। আর একটা কথা মনে রাখবে, আমি তোমাকে লাইনের মেয়ে ভাবি না। কাউকে ভাবি না। নারী পুরুষের সম্পর্ক সব সময় পবিত্র— ভালবাসা থাকলে কোনও অপরাধ হয় না। তা হলে তিনি কবিতা চর্চা করতেন। তুমি একজন কবির স্ত্রী!

খান না। শোবেন না?

খাচ্ছি তো।

এটা খাওয়া বলে!

তুমি খাও। আমি এত খাই না। আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়। আপনার মতো মানুষ তো সব সময় মেলে না। কেউ একগুচ্ছ গোলাপ উপহার দিতে পারে আমার জানাই ছিল না। আপনি খেলে আমরা শুয়ে পড়ব।

তারপর কী হবে!

আপনি জানেন না তারপর কি হয়!

আমার মেয়েটা অ্যাসাইলামে কী করছে জানি না। মেয়েটা ক্ষেপে যেতে পারে আমাদের উপর। সে চেঁচামেচি করতে পারে। সব লন্ডভণ্ড করে দিতে পারে। তোমরা আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেলে! আমি খুন করব। সবাইকে খুন করব।

হৈমন্তি বলল, আপনি থামুন প্লিজ। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কার কপালে কী থাকে, কেউ জানে না। আমার ভয় করছে।

ভয়ের কী আছে। আমি তো তোমার সঙ্গে আছি।

আমি আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনি আমার সঙ্গে থাকলে কী উপকারটা হবে! যেটুকু উপকার করলে আমার ছুটি হয়ে যায়, তাও তো আপনি করছেন না। নিজের কষ্টের কথা সাতকাহন করে শুধু শোনাচ্ছেন। আপনার যেমন অরুন্ধতী আছে, আমারও তেমন বাণীব্রত আছে। তাকে একা রেখে আসতে হয়। আপনার কি মায়া হয় না!

মানুষটি তার দিকে তাকিয়েই আছে।

হৈমন্তির এত কথা ভাল লাগছে না।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া দরকার। কিছুটা খেয়ে কেউ কেউ বিছানায় চলে যায়। শুয়ে শুয়ে খায়। কখনও তাকে গ্লাস হাতে নিয়ে বসেও থাকতে হয়। তার শরীরে হাত দেয় এবং খোঁজে। খুঁজে পেয়েও যায়। এবং তখন স্তন এবং যোনিদেশ ছাড়া তারা আর কিছু চায় না।

তার কাজ বসে থাকা।

তার কাজ শরীর মেলে ধরা।

তার কাজ পুরুষটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিপে দেওয়া। মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া। এবং নানা প্রকারের ভঙ্গী নিয়ে বসে থাকতে হয়। ক্লায়েন্ট যা চায়, কোথাও সে বাধা দিতে পারে না।

এ-সব মনে হয়, অথচ মানুষটা কেমন নির্বিকার।

হৈমন্তি বলল, বসেই থাকবেন!

আচ্ছা হৈমন্তি ভায়লেন্ট হয়ে গেলে কি অ্যাসাইলামে মারধোর করে! ইলেকট্রিক শকও দেওয়া হয় শুনেছি— তুমি কিছু জান!

না আমি কিছু জানি না।

আচ্ছা তুমি তো কবির নাম বললে না।
আপনি বলেছেন। আমি কি আপনার নাম জানতে চেয়েছি।
হৈমন্তি ফের বলল, কি শোবেন না!
মানুষটা হা হা করে হেসে উঠল, এত তাড়াতাড়ি? বলে গ্লাসের তলানিটুকু খেয়ে আবার ঢেলে নিল।
— আরে তুমি কিছুই খাওনি দেখছি!
কথাবার্তায় তো মনেই হয় না পাকা নেশুড়ে। অথচ খেয়ে যাচ্ছে। এটা কি আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে!
হৈমন্তি ওঁকে শান্ত করার জন্য বেশ কিছুটা গলায় ঢেলে দিল। অর্থাৎ সেও কম যায় না। সতীপনার জায়গা তো আর এটা নয়। মানুষটার সব রকমের প্লেজারের সঙ্গী হতে না পারলে তার বদনাম হয়ে যাবে। চক্রবর্তীবাবুই মাঝে মাঝে বলবেন তোমার যে কী হয়! কমপ্লেন আসে কেন!
প্রথম প্রথম চক্রবর্তীবাবু ক্লায়েন্টদের কমপ্লেনের কথা বললে, হৈমন্তির বুক দুরুদুরু করত। বলতে পারত না ও স্যর মানুষ না। জন্তু। জানোয়ার। অসভ্যতার চূড়ান্ত। কী যে করতে চাইছিল! তবে এখন সে সব পারে। শরীর নিয়ে তার বিন্দুমাত্র শুচিবাই নেই।
হৈমন্তি ভাবল, অপেক্ষা না থাকলে হয়! অপেক্ষা না থাকলে ভালবাসা সম্পূর্ণতা পায় না!
সত্যব্রতের মধ্যেও অপেক্ষার অভাব ছিল। ভালবাসা ভোগ করার বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল।
হৈমন্তি হাত ধরে বলল, চলুন না শুই।
আচ্ছা হৈমন্তি আমি যদি তোমার বাড়িতে থাকি আমাকে তুমি রাখবে! আমি তোমার হাটবাজার করব, আমি তোমার বাণীব্রতকে স্কুলে দিয়ে আসব, স্কুল থেকে নিয়ে আসব— তারপর জামা প্যান্ট পালটে ওকে খেলার মাঠে নিয়ে যাব। সাঁজ লাগলে তুমি আমাদের খুঁজতে যাবে— আমাদের ধমক দেবে— ইস আপনার কাণ্ডজ্ঞান নেই। কার্তিকের ওস খুব খারাপ। হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যায়। পুত্রটিকে বলবে, দু'জনেই সমান।
ইস এ-সব কথা আপনার মাথায় এসেছে কেন, আমি তো আপনাকে চিনিই না। নামও জানি না।
হৈমন্তি আমার নাম রাঘব দত্ত। আর কী জানতে চাও।
না আর কিছু না।
হৈমন্তি ভাবল, রাঘব দত্ত। খুব চেনা নাম যেন। অথবা যদি মধুসূদন দত্তের ভাইপো হয়। হৈমন্তি নিজের মনেই হেসে ফেলল।
তিনি বললেন, সারাটা দিন ঘুরেছি। খুব ধকল গেছে। সকালে অ্যাসাইলামে, দুপুরে অফিস— অফিসে বসতে পারলাম না। কেমন এক অস্থিরতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। কোথাই যাই!
কেন বাড়ি।
সেই একাকিত্ব।
কেন সংসারে তো কত দায়। আপনার ছেলে মেয়েরা।
কেউ থাকে না। যে যার মতো উড়ে গেছে। এত বড় বাড়িটা খালি। তবু অরুন্ধতি ছিল, সেও নেই। সে এখন অ্যাসাইলামে কী না জানি করছে!
তাকে অ্যাসাইলামে দেওয়ার কী হল?
কী হল! ভায়লেন্ট হয়ে গেলে আমার দিকে তেড়ে আসত। খুন করব বলত, কাউকেও ছাড়ছি না— আমি পাগল। শেষ পর্যন্ত বাবা তুমি আমাকে একটা লম্পটের সঙ্গে বিয়ে দিলে! মেয়েটা আমার হাউ হাউ করে কাঁদত।
শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শেই অ্যাসাইলামে দিতে হল।
আপনার ঘুম পাচ্ছে। আপনার হাই উঠছে।
তারপর তিনি বললেন, তুমি কিন্তু সারারাত থাকবে। আমাকে একা রেখে কোথাও যাবে না। মিস্টার চক্রবর্তী কিছু বলেনি! সে তো আমার পরিচয় জানে।
হৈমন্তি বলল, না।
একটা বাস্টার্ড। বিপদে পড়লে স্যর স্যর।
টেবিলের একদিকটায় পোর্টেবল টাইপরাইটার। একটা ক্যামেরা। কিছু ছবি ইতস্তত ছড়ানো।
হৈমন্তি ছবিগুলো চিনতে পারল।
আপনি রিপোর্টার!
তিনি কেমন সজাগ হয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়ালেন। ব্রিফকেসটা কী কারণে খোলা রেখেছেন কে জানে! কিছু কাগজ, কিছু ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।
হৈমন্তি একটা কাগজ এবং কিছু ছবি তাঁর সামনে মেলে ধরল।
আপনি রিপোর্টার, আমি কি ঠিক বলেছি! সিগারেট বের করার সময় ব্রিফকেসটি তিনি খুলে রেখেছিলেন— মনে পড়ছে। পরিচয় বের হয়ে পড়ায় খুবই বিপন্নবোধ করছেন।
হৈমন্তি বলল, সে আপনি যাই হোন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। পলিটিক্যাল লিডার হলেও না— সব এক। আমাদের শরীর ছাড়া এদের তুল্যমূল্য বিচার করা যায় না।
আপনারা বড় বড় কাজ করেন। বড্ড টায়ার্ড। রিল্যাকসেশন। ধর্ষণের খবর যত আছে সব বড় বড় হরফে ছাপেন। আপনাদের খারাপ লাগে না। ধর্ষণের কপি ধরিয়ে আপনারাও যে ছোটেন— ধর্ষণ বিষয়টা খুব রিলেটিভ ব্যাপার।
শোনো হৈমন্তি, আমি এসেছি একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেতে। বিশ্বাস করো বাড়িতে লোকজনের অভাব নেই। তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমার ঘরে কেউ ঢুকতেই সাহস পায় না। কেন বলতো, আমি বাঘ না ভাল্লুক বলো।
হৈমন্তি তাঁর এই নির্বিকার আচরণে বোধ হয় খুবই চটেছে। রেগেমেগে বলল, আমরা আপনাদের এত ভাল দিতে পারি, আর কেউ বোধ হয় সেটা পারে না। কত যে দুঃখ এ-পৃথিবীতে— আপনারা না এলে জানতেও পারতাম না। অথচ আপনারা কত সুন্দর সুন্দর কথা লেখেন। শুধু আসল সমস্যাটা এড়িয়ে যান— কি ঠিক কি না!
হবে হয়তো?
আজ্ঞে না, হবে হয়তো নয়। কাল রাতেও একজন মাতাল হয়ে বলে গেল, তার স্ত্রী বন্ধুর সঙ্গে ভেগে গেছে, সেই নিয়ে সহজে আমাকে ছাড়তেই চায় না। সে-জন্য সে এসেছে—
তারপর সে বলল, সব মিছে কথা। লোকটা আসলে বউকে ফাঁকি দিয়ে এখানে এসেছে। একঘেয়েমি থেকে আসলে মুক্তি পাবার জন্য আসে। জানেন এরা আসে বলেই আমরা বেঁচে থাকি। আমরা বেবুশ্যে না হলে আপনারা কোথায় যেতেন!
রাঘব বলল, তুমি আমাকে অপমান করছ।
অপমান করব কেন, যা সত্যি তাই বললাম।
হৈমন্তি কি পলিটিশিয়ান। তিনি ভাবলেন।
তিনি বললেন, তুমি কি কখনও পলিটিক্স করেছ?
হৈমন্তি হা হা করে হাসল।— পলিটিক্স না করলেও আপনারা তো আছেন। একসঙ্গে মাখামাখি হলে শরীরে গন্ধ লেগে থাকে না! ওই গন্ধে গন্ধে যতটা আর কী! চলুন না শোবেন, সে হাত ধরে টেনে তুলতে চাইল। গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে কবে থেকেই ভাল ভাল কথা আপনাদের পড়েছি। আমার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্মান দিন। এটাই আমাদের রোজগার, পারিশ্রমিক বলতে পারেন। আমার তো এখন আপনাকে নিয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। খুব খুব, আসুন না।
রাঘব দত্ত ঘড়ি দেখলেন।
বেশি রাত হয়নি। তুমি তো সারারাত থাকবে। চক্রবর্তীবাবু কিছু বলেনি!
হৈমন্তি চুপ করে গেল।
যা করছে করুক। হৈমন্তি পাশের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সায়া শাড়ি আলগা করে প্রায় সব কিছু শরীরের দর্শনীয় করে তুলতে চায়। তিনি তাকাচ্ছেনও না তার দিকে।
টেবিলের নীচ থেকে একটা কাগজ তুলতে গিয়ে তিনি তার শরীর দেখে বললেন, তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন হৈমন্তি। ঠিক হয়ে শোও।
হৈমন্তি জানে এই হচ্ছে গেরো। যতক্ষণ গেরোটা না খুলবে, তুমি সারারাত থাকবে, তোমাকে ছাড়া বাঁচব না ডার্লিং— আহা কি শরীর, পাঁঠার মাংসের মতো। আর কখনও বেশি ইতর লোক হলে মাগি ফাগি যা মুখে আসে সম্বোধনে ষষ্ঠি তৎপুরুষ করে ছাড়বে। এই মানুষটার সেই গুণটা নেই।
কী করবে ভেবে পাচ্ছে না হৈমন্তি।
তিনি কিছু টাইপ করা কাগজ বিছানায় নিয়ে গেছেন। শুয়ে তাই পড়ছেন।
সে ডাকলে তিনি বললেন, পড়ে দেখছি ঠিক আছে কী না। তারপরই বললেন, বুধবারের কাগজে এডিটোরিয়াল পাতায় লেখাটা ছাপা হবে।
হৈমন্তি শুয়ে শুয়েই দেখছে।
তিনি বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ছেন। এবং এই কাজে বিশেষ মগ্নও মনে হল তাঁকে।
হৈমন্তির মনে হল তার নাক ডাকছে।
তিনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন।
আচ্ছা ঝামেলা হল! সে যে কী করে!

একবার কাছে গিয়ে দেখল, প্রকৃতই তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। একজন নিঃস্ব বালকের মতো তার এই ঘুম ভাঙানোও যায় না। তার জন্য ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে এটা তার অপরাধের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেবে। তাকে একা ফেলে হৈমন্তি যেতেও পারছে না!

কী আর করা!

সে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। যদি মানুষটার ঘুম ভাঙে।

তারপর দেখা গেল হৈমন্তি নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আলো জ্বলছে। গোলাপের গুচ্ছটি ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে।

যে মিউজিক রিন রিন করে বাজছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল।

রাঘব দত্ত প্রকৃতই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

■

শেষরাতের দিকে খুটখাট শব্দে রাঘবের ঘুম ভেঙে গেল। কেউ নেই ঘরে। ঘরটা খালি। হৈমন্তি কি চলে গেল। তা তো কথা ছিল না। আর এত সকালে— কী যে হয় তাঁর ঘুমের মধ্যেও তাঁর কেন জানি মনে হয়েছে, কারও হাঁটা চলার শব্দ পাচ্ছিলেন। বেশ ঠান্ডা লাগছে। কুলিং মেশিন বন্ধ করে দিলে আবার গরমও লাগবে। তিনি চাদর সরিয়ে উঠে পড়লেন।

দু-কাপ চা টেবিলে কেউ রেখে গেছে।

গরম চা।

বাথরুম বন্ধ।

তিনি জানেন না হৈমন্তি চলে গেছে, না বাথরুমে গেছে।

বাথরুম বন্ধ দেখেও তিনি বসে থাকতে পারলেন না।

বাথরুম এমনিতেই বন্ধ থাকে অনেক সময়।

তিনি কাচের দেওয়ালের সিল্কের পর্দাটি সরিয়ে দিতেই ভোরের কলকাতা দেখতে পেলেন।

ভিস্তিওয়ালারা জল দিচ্ছে।

ঠেলা গাড়িতে দিনমজুররা সব শুয়ে আছে।

কয়লার উনুন কেউ ধরিয়েছে। তার ধোঁয়া উঠছে। ফুটপাথের চা-এর দোকানে ভিড় বাড়বে একটু পরেই— লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে।

তিনি কান পেতে আছেন।

বাথরুমে যদি জলপড়ার শব্দ শোনা যায়। দরজায় টোকা দিতে তার সংকোচ হচ্ছে।

তাঁর হাই উঠছিল। ঘুমের রেশ কাটেনি। কিন্তু যদি চলে যায়।

যেতেই পারে। যাওয়ারই কথা। নেশা হলে অনেকেই অনেক কিছু বলে, হৈমন্তির এমন মনে হতেই পারে। হৈমন্তি যে রাজি হয়নি— তাও সে জানে। তবু সে যদি যায়। হৈমন্তি কি তাকে চিনে ফেলেছে!

এই প্রথম এমন একটা সংশয় দেখা দিল তার মনে।

আর তখনই দেখল, বাথরুম থেকে হৈমন্তি ফ্রেশ হয়ে বের হচ্ছে।

আপনি উঠে পড়েছেন!

রাঘব তার দিকে শুধু তাকিয়েই থাকল।

বেড-টি রেখে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে খান।

তাঁর বাসিমুখে চা খাওয়ায় অভ্যাস আছে। তিনি সোফায় গা এলিয়ে দেওয়ার আগে কাপ হাতে তুলে নিলেন, তুমি খাও।

আমি কিছু খাব না।

প্লিজ খাও। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

আপনার মাথাটা দেখছি এখনও ঠিক হয়নি।

না না আমি সত্যি যাব।

শুনুন চা খাচ্ছি। মাথা থেকে পাগলামিটা সরান।

কেমন বালকের মতো বলল, গেলে কী হয়!

কী হবে! বোকার মতো রাত থেকেই বায়না করছেন। আমরা ফ্লাইং প্রস্টিটিউট, সেটা কি বোঝেন!

হৈমন্তি!

রাঘব চেঁচিয়েই কথাটা বলল। যেন হৈমন্তির কথা তার যথেষ্ট পীড়নের কারণ।

ঠিক আছে আর বলব না।

কেমন শান্ত হয়ে গেল রাঘব। সে আর গুম মেরে বসে থাকতে পারল না। বেয়ারাকে ডেকে বিল আনতে বলে দিল।

তুমি চা খাবে না। বসেই থাকবে।

আমি যাব।

আমিও যাব।

কোথায়!

তোমার সঙ্গে।

ছেলেমানুষি করবেন না।

চা খাও।

গরম চা খেতে পারি না। ঠান্ডা না হলে খেতে পারব না।

তোমার পার্সটা দেখি।

কী হবে দেখে!

ঠিক আছে। বাথরুমে যাচ্ছি। আমার অ্যাটাচি থাকল। মেলা টাকাপয়সা আছে। আমি আসছি।

হৈমন্তিকে কোনও কথা বলতে না দিয়েই রাঘব বাথরুমে ঢুকে গেল। এবং সে দেখল অ্যাটাচিটা খোলাই আছে। আর যা দেখল তাতে তার আরও খারাপ লাগল। টাকাপয়সা, চেকবই কিছু জামাপ্যান্ট আর একটা ডায়েরি।

তাড়াতাড়ি সে তার নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল। বের হয়ে যদি তিনি টের পান— তা-ছাড়া সব দেখে তার নিজের মাথাই কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

সে পালাবে!

সে থাকবে! তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে! সব খুলে বলবে— আপনার কি মনিকাকে মনে আছে!

না সে এ-সব কিছুই বলতে পারবে না। যার খোঁজে বের হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত সত্যব্রতের পাল্লায় পড়ে গেল। সে কবিতাও লিখত, সেই মানুষটাকে নিয়ে কবিতা কত কবিতা লিখেছে!

সত্যব্রত বলেছিল, আমি তাঁকে চিনি।

কিন্তু জেদ ধরলে নানা বাহানা করত। সত্যব্রত বলত, তিনি মুম্বইতেই বেশি থাকেন। একটা ইংরাজি কাগজের কলকাতা এডিশনে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক।

অফিসে যান।

দেখা হবে না।

কেন।

ব্যস্ত মানুষ। তাঁর তো গুণমুগ্ধ পাঠকের অভাব নেই।

সে তো আর তখন হৈমন্তি নয়। সে তখন মনিকা থেকে সুরমা।

আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখতে চাই। তাঁর লেখা একটা চিঠি পেলেই আমি খুশি।

চিঠি লিখলেও উত্তর পাবে না।

কেন?

চিঠির উত্তর দিলেই আবার চিঠি।

তাঁর কোনও সেক্রেটারি নেই।

না।

এত বড় মানুষ তিনি, কোনও সেক্রেটারি নেই! তুমি মিছে কথা বলছ সত্যব্রত।

তুমি তাঁর ঠিকানা যোগাড় করে দাও। আমি আর কিছু চাই না। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আপনি আমার জীবন পালটে দিয়েছেন জানিয়ে আসব।

এ-রকমের অজস্র চিঠি তিনি পান— কিছুরই মূল্য দেন না। তাঁকে বড় বড় অনুষ্ঠানেও দেখা যায় না। তিনি গোপনে বেঁচে থাকতে ভালবাসেন।

সুরমা কিছুটা যেন ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ এ কী দুরবস্থা আপনার! শেষে এখানে উঠে এলেন।

এমন তিনি বলতেই পারেন।

তার পালানোই উচিত।

আর তখনই বাথরুমের দরজা খুলে গেল।

তিনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন!

চেনার তো কথা নয়। কারণ তাঁর সঙ্গে সুরমার জীবনেও দেখা হয়নি। শুধু একবার ফোনে কথা হয়েছিল।

তাঁর একটি উপন্যাস পড়ে— সে রাতে ঘুমাতে পারত না।

সে লেখকের সঙ্গে এক অদ্ভুত কল্পনায় ডুবে যেত।

লেখক মানুষটিকে তার খুবই দেখার ইচ্ছা হত।

সে তার পাঠ্য বইয়ে মন দিতে পারত না। স্কুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকত— কী যে ম্যাজিক আছে লেখাটায়— এত বড় একটা উপন্যাস— কোথাও মনে হয়নি, কখনও মনে হয়নি দীর্ঘ উপন্যাস— বার বার একই

পরিচ্ছেদ পড়ত, আর চোখ বুজে ফেলত চোখে জল আসত। লেখকের ফোন নম্বরও তার হাতে আচমকা এসে যায়।

তার তরুণ পরিচিতরা কেউ জানে না তাঁর ঠিকানা। এমনকী তার মনে আছে, ফোনে তাঁর গলা শুনে প্রকৃতই তিনি কী না, লেখককে বলেছে— আমি ক্লাস এইটে পড়ি। স্কুলের দিদিমণি বলেছিল, তোমরা এ-বইটা পড়। মন ভাল হয়ে যাবে।

বইটা পড়লাম। আমি এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। দীর্ঘ আটবছর সারাদিন সারারাত আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। ফোনের ডায়েরি খুঁজে দেখেছি। জানেন তো আমাদের বাড়িতে ফোন নেই। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ফোন আছে— সেখানে কোথাও আপনার নাম পেলাম না– কী খারাপ লাগত!

তখন রাজীবজির জমানা চলছে। তখন কমপিউটারের প্রথম খবর পাই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার রাজি না। বহুলোক বেকার হয়ে যাবে— আপনি কী শুনেছেন!

তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ শুনতে ভালই লাগছে। তারপর তো ইন্টারনেট এসে গেল— ইন্টারনেটে সার্চ করে আপনার ফোন নাম্বার পেয়ে গেলাম। এত বছর পর আপনাকে খুঁজে পেলাম। আপনি কি ফোন ছেড়ে দিয়েছেন?

আমি যখন এইটে পড়ি, রাজীবজি আততায়ীর হাতে খুন হলেন। আমার যে কী কান্না পাচ্ছিল, আর তখনই বইটার কথা মনে হল, পড়েও ফেললাম। তারপর আর এক খোঁজ। সনিয়াজির আমল। কমপিউটার ইন্টারনেট কী নেই— ইন্টারনেটে সার্চ করতে গিয়ে আপনাকে পেয়ে আমার আর দুঃখই থাকল না।

সুরমা মনে করতে পারছে, ধৈর্য ধরে তিনি শুনছেন। বৈচি স্টেশন জানেন!

নাম শুনেছি। বোধ হয় কর্ড-লাইনে পড়ে।

আপনি ঠিকই শুনেছেন। স্টেশন থেকে ক্রোশখানেক পশ্চিমে গেলে আমাদের গ্রাম। আমার বাবা ধানচালের ব্যবসা করে।

আপনি শুনছেন।

হ্যাঁ শুনছি।

আপনাকে যদি মাঝে মাঝে ফোন করি রাগ করবেন না তো?

না না রাগ করব কেন!

তারপর আর ফোন করা হয়নি। সত্যব্রত আমার স্বামী, সে আপনাকে চেনে। সে আমাকে কথা দিয়েছিল, আপনার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবে। সে যেখানে যেত, আমাকে নিয়ে যেত— কবিতার আসরে সত্যব্রতর ছিল খুবই প্রভাব। সারকিট হাউজে আমরা আছি— থাক আর কিছু বলব না।

আচ্ছা বোলো না। বলার মতো কথা না হলে বলবে কেন!

আমি কিন্তু আবার ফোন করব।

নিশ্চয় করবে।

সুরমার আর ফোন করা হয়নি। তিনি জানেন না সত্যব্রত আর বেঁচে নেই। তার এখন বাণীব্রত আছে। চাকরির উমেদারি করতে গিয়ে তার আর মনেই নেই, কাউকে তার ফোন করার কথা ছিল এবং পেটে বাণীব্রত, তারপর ভুজঙ্গ। তারপর সেও নেই। সে তখন একা নির্বান্ধব। বিয়েতো হয়নি, সিঁদুরও পরতে পারে না। তবে সত্যব্রতের সঙ্গে রেজিস্ট্রি হয়েছিল, ভুজঙ্গর সঙ্গে তাও হয়নি। আসলে, আপনিই দায়ী মশাই আমার এই পরিণতির জন্য। আপনাকে যদি এখন খুন করি আপনি কি খুশি হবেন।

কী হল বসেই আছ দেখছি।

বাথরুমে এতক্ষণ লাগে! আমি উঠছি। আপনার ব্রিফকেস খোলা। যেতে পারছিলাম না।

এমন দামি কিছু নেই। ব্রিফকেস নিয়ে আমার এখন কোনও উৎকণ্ঠাও থাকে না।

টাকা পয়সা। চেকবই— সব হাঁ করে যে গিলতে আসছে।

কাকে?

আমাকে!

ঠিক আছে, বাড়ি যাই— কী আছে না আছে দেখা যাবে।

এতটা নিশ্চিন্তে লোকটা থাকে কী করে?

তিনি ব্রিফকেস বন্ধ করে বললেন, ব্রেকফাস্ট সেরে গেলে হয় না!

না।

কেন না।

বাণীব্রত জানালায় অপেক্ষা করবে। যত দেরি হবে, তত সে ঘাবড়ে যাবে। আমার একমাত্র অবলম্বন।

তা অবশ্য ঠিক।

সুরমা উঠে বলল, জামাকাপড় পালটালেন না?

দরকার হবে না। আমরা ট্যাক্সি নেব।

না আমি ট্রেনে যাব। আমার অত পয়সা নেই।

সে ভাবতে হবে না।

তবু যাব না।

কেন? ট্যাক্সিতে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারব।

আমাদের এলাকাতে ট্যাক্সি ঢোকার রাস্তা নেই।

স্টেশন থেকে কতদূর।

রাঘব বেয়ারাকে ডেকে বলল, আমরা যাচ্ছি। এই নাও বখশিস। বলে তাকে তিনি একটি একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিলে হৈমন্তি থাবা মেরে টাকাটা নিয়ে নিল।

আপনার কি কান্ডজ্ঞান নেই, আর রহমান তুমিও আছ বেশ, বাবু দিলেন, নিয়ে নিলে।

রহমান এই দিদিমণিকে ভালই চেনে— বিপদে আপদে তিনি ধারও দেন, অথচ টাকাটা নিয়ে নেওয়ায় সে যেন বেকুব বনে গেছে।

শোনো রহমান, বাবুর মাথা ঠিক নেই। বাবু এখন তার ব্রিফকেসটা চাইলে তাও তোমাকে দিয়ে দিতে পারে। নেবে তুমি।

জি না। তারপর তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল সুরমা, কী যে ঝামেলা বাঁধালেন!

তিনি বেয়ারাকে ফের ডাকলেন।

সে এলে তাঁকে আবার একটা একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, যাও। না হলে আবার থাবা মেরে নিয়ে নেবে।

সুরমা ফের ডাকল রহমানকে, এটাও নিয়ে যাও। বলে টাকাটা তাকে ফেরত দিয়ে বলল, আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আর কেউ কোনও কথা বলল না।

নীচে নেমে সুরমা তাঁর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। আর এখন যত দ্রুত সম্ভব ফার্স্ট লোকাল ধরা দরকার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

হনহন করে হাঁটছে। পেছনে তাকাচ্ছেও না। তিনি তাকে অনুসরণ করছে কী না তাও দেখছে না।

ট্যাক্সিতে ওঠো। পাগলামি কর না।

রাস্তায় তামাশা সৃষ্টি হোক হৈমন্তি চায় না। সে ট্যাক্সিতে উঠে বসলে তিনি বললেন, বেলঘরিয়া স্টেশন। ব্রিজের নীচে আমরা নেমে যাব।

তারপর তিনি বললেন, শহরটা কেমন খালি খালি মনে হচ্ছে না? লোকজন বিশেষ নেই— শহরটার ঘুম ভাঙছে। আমার কিন্তু দারুণ লাগছে।

সুরমা বলল, আমি হৈমন্তি নই আর মনে রাখবেন। আমি সুরমা, মনে থাকবে!

থাকবে।

আপনি বাবু যা করছেন!

কী করলাম।

কী করলেন না বলুন। আমার রাতটাই মাটি। আমাদের খেটে খেতে হয়, খাটলে পয়সা, না খাটলে কী হয় বুঝতেই পারেন। আপনি আমার পরিশ্রমের মর্যাদাও দিলেন না। অ্যাসাইলামে মেয়েকে রাখতে গিয়ে মাথাটাই খারাপ করে ফেলেছেন— আর আমার—

তারপর কিছু বলল না, কেন যে চুপ করে গেল।

তিনি বুঝলেন, সুরমার জীবনেও কম বিপর্যয় আসেনি, কিন্তু সুরমা ভেঙে পড়েনি। সুরমা থেকে হৈমন্তি— সোজা রাস্তায় এখানে যে আসা যায় না তাও জানেন। কবির স্ত্রী থেকে লাইনের মেয়ে হয়ে যাওয়ার মধ্যেও নানা বিড়ম্বনা গেছে তার। কিন্তু সে সোজা সরল বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সোজা না থাকলে তার পুত্রের বিপন্নতা বাড়বে।

তিনি বললেন, সুরমা তুমি খুশিমতো আমার পরিচয় দেবে। নামে কোনও আমায় দ্বিধা নেই।

সুরমা ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ-বাড়ির সবাই— সবাই বলতে বাণীব্রত আর সুকুমারী বাবু মানুষটির এত অনুগত যে মনেই হয় না তার আর কোনও মূল্য আছে। সকালে উঠেই প্রাতভ্রমণে বের হন তিনি। ফিরে আসার সময় বাজার করে ফেরেন। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়েও বাবুটির বিশেষ লক্ষ আছে। দশকাঠার মতো জমিতে কত কিছু করা যায়, তিনি বাড়ির উত্তরের দিকটায় কয়েকটা ফলের গাছ লাগাবেন বলে স্থির করেছেন। বলেছেন শত হলেও কবির বাড়ি এত ন্যাড়া হলে চলে না। বাড়িতে একটি ফোনের লাইনও এসে গেছে। স্কুলে যাবার সময় বাণীব্রত সোজা তার দাদুর ঘরে চলে আসে।

দাদু চল।
তিনি গায়ে জামা গলিয়ে তার সঙ্গে বের হয়ে পড়েন। পাড়াটা তার চেনা হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি সবই প্রায় টিনের ছাউনি দেওয়া, ইটের দেওয়াল, পাকা মেঝে। এবং দুটো শোওয়ার ঘর তাদের।
একটা পুরো ঘরই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাশের ঘরটায় সুরমা তার পুত্র আর সুকুমারী থাকে। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। দু-দিকে দুটো কাঠের গেট। একটা সদরের দিকে আর একটা অন্দরের দিকে। রেল-লাইনে উঠে যাওয়া যায় অন্দরের গেট খুলে।
সামনেই ছোট একটা প্রান্তর। আবাদি। জায়গাটা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা আছে। পাশে রামকৃষ্ণ মিশনের এলাকা। বিশাল এলাকা জুড়ে মঠ মন্দির, পাকা রাস্তা— বিকেলের দিকে ভিড় হয়। তিনি নিজেও একদিন বাণীব্রতর হাত ধরে ঘুরে এসেছেন। মন্দিরের সামনে বসে, অরুন্ধতীর জন্য প্রার্থনা করেছেন।
এবং এক সকালে সুরমা যে কোথায় চলে গেল— কিছুই বলে যায়নি।
তিনি খুবই চিন্তিত।
কোথায় গেল। কোথায় যেতে পারে।
ফিরে এল রাতের দিকে।
এসেই তার ঘরে ঢুকে বলল, আপনাকে কাল নিতে আসবে।
নিতে আসবে কেন, আমি নিজেই যেতে পারি।
তা-হলে যান। আমাকে আর জ্বালাবেন না।
কোথায় যাব?
বাড়ি যাবেন। মাসিমা এত ভালমানুষ, আর তাঁকে বলছেন মুখরা, তার গঞ্জনা সহ্য করতে পারছেন না, সকালে শুরু হয়, রাতে শেষ হয়। বড়দা তো বলল, বাবাকে কত বলেছি, মাকে অ্যাভয়েড করতে শেখো না, তাঁর তো দেখার লোকের অভাব নেই— তুমি একতলার বসার ঘরে যতক্ষণ থাকো, ততক্ষণ তো ঝামেলা হয় না, উপরে উঠলেই যত ঝামেলা। রিটায়ার করলে এই হয়।
বাবু মানুষটি হাঁ। শুনছে। মেয়েটা তাঁর বাড়ি গেছে। আর তার যা বাড়ি, রান্নাঘর সামলায় মানসী— না দিদি এ-বাড়ি থেকে না খেয়ে কেউ যায় না।
আরে না অসময়ে।
না দিদি যাবেন না। মাসিমা খারাপ ভাববে— কতদূর থেকে এল মেয়েটা, বেলঘরিয়া কি কাছে— কখন পৌঁছাবে, কখন খাবে!
মাসিমা তো এখন বেশ হাঁটাচলা করতে পারেন।
মাসিমা আমার নাম জানে না, বললেন, তোমার নাম কী যেন বললে!
সুরমা, দ্যাখ বাবুর লেখার ঘরের অবস্থা।
সত্যি খারাপ লাগে দেখতে! নতুন নতুন সব বই— আর অজস্র ফাইল, প্রুফের বান্ডিলের ডাঁই হয়ে আছে। কারও সময় হয় না। একটা প্লাস্টিকের রঙচটা চেয়ার, কেউ সাফ করে না। যার যার কাজের লোক তার তার ঘরে, বাবুর কাজের লোক সারাক্ষণ মাতব্বরি করে বেড়ায়। ওকে আমি ঠিক তাড়াব।
এবার সুরমা থামল।
হাসলে কেন— তারপর কী হল!
কিছু হয়নি।
লেখার ঘর এমন হয়! টেবিল ফাইলে ভর্তি। একটা আলনা পাশে। সামনের ঘরে শুধু একটা খাট। একটা লকার। আলনাটা সিঁড়ির ঘরের পাশেই তো থাকতে পারে।
পারে কি না বলুন!
পারে। তবে কেউ আমাকে নিয়ে আদৌ ভাবে না, আমি কী লিখছি, কেন লিখছি তারা ভাবে না— নাতি নাতনিরা কাগজে লেখা বের হলে, বলবে দাদুর লেখা বের হয়েছে। এই পর্যন্ত। কেউ পড়ে না। পুত্ররা কন্যারা একসময় পড়ত, এখন আর পড়ে না। বউমারা সব বড় বড় চাকরি করে— তাদের সময়ই হয় না। তারা পড়ে না।
ঘরটার যা অবস্থা, দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল। এখানে সেখানে ডাঁই হয়ে বই সব। এক তলায় র‍্যাকে বই সব। সর্বত্র বই। আর ধুলো জমছে।
তোমার মাসিমা আর কিছু বলল না!
আর কী বলবে!
কী যে বলো! সে বলবে না। সে তো মনে করে দুনিয়াসুদ্ধ তাঁর সব ছাত্র। এলেই বলবে কোন কলেজ, কোন ডিভিসন, কোন ব্যাচ!
মাসিমা এ-বয়সেও কী সুন্দর! বলল, তুমি যখন এসেই গেছ, আর বলছ তাঁর লেখার গুনগ্রাহী, তখন তার ঘরটা গোছগাছ করে দিয়ে যাও। তারপর উঁকি দিয়ে বললেন, দেখেছ, কাজের মেয়েটা কি ফাঁকি দেয়। ঝুলকালিতে ঘরটা নোংরা তাঁর চোখে পড়ে না, কী করে হবে বল, তিনি নিজেই এত অগোছালো তার কথা আমরা ছেড়েই দিয়েছি। তখনই সুরমার মনে হল, বিকেলের চা দিয়েছে কী না সুকুমারী। আপনার চা দিয়েছে সুকুমারী! আপনার একটাও পাণ্ডুলিপি নেই। শুধু জেরক্সে ভরতি সব।
কেউ ফেরত দেয় না।
দেয় না কেন!
কী হবে। না দিলে কী করব!
বলতে হবে তো, লেখা নিতে হলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে যেতে হবে।
আজকাল বলতে পারি। আগে তো সেই জোর ছিল না। এমনিতেই নানা সংশয়ে ভুগি— এই বুঝি কপি ফেরত এল— আমার হাতের লেখা ভাল না। তারা এত কষ্ট করে কম্পোজ করে ফাইনাল প্রুফ পাঠায়, তারপর আর পাণ্ডুলিপি ফেরত চাওয়া যায়? তারপর থেমে বলল, আমার বাড়িতে গেলে, আমাকে বলে যাবে না?
আপনার ঠিকানা আমাকে দিয়েছেন? গেলে দোষ! শুধু বই। নতুন বই, নতুন এডিসনের বই, গল্পসমগ্র পাঁচ খণ্ড। উপন্যাস সমগ্র— আবার রচনাবলীও দেখলাম বের হচ্ছে। শুধু পাণ্ডুলিপি নেই। আপনার কি মনে হয়নি এই সব বই-এর ভবিষ্যতে পাণ্ডুলিপির কোনও গুরুত্ব থাকতে পারে?
না মনে হয়নি।
আপনি কি মানুষ!
তিনি বললেন, তুমি তো দেখছি তাঁর মতোই কথা বলছ! শুধু অভিযোগ।
কার মতো কথা বলছি।
তোমার মাসিমার মতো।
তিনি বলে আপনাকে সহ্য করেছেন। মাসিমা তো বললেন মানুষ না অপদেবতা। কোন এক ভাইপোকে এনে রেখেছিলেন, কিছু যদি করা যায়— একটা ফাঁকিবাজ জুয়ারি ছেলে— জানলেনও না। সে নাকি মাসিমার সমস্ত অলঙ্কার চুরি করে আপনার দেশের বাড়িতে হাওয়া হয়ে গেছে। বললেন, এটা কি আর বাড়ি আছে, সরাইখানা হয়ে গেছে।
তা গেছে। সে আর আসে না। সে চুরি করেছে না অন্য কেউ কী করে জানব বলো— আমি তো নিজের চোখে দেখিনি— তাকে দোষ দিই কী করে?
তোমার মাসিমার এই এক দোষ— যে আসবে তাকেই সাতকাহন করে, আমার মা ভাইবোনদের সম্পর্কে নানা অভিযোগে অতিষ্ঠ করে তুলবে। আমার জন্য নাকি সে সংসারে নাজেহাল। গরীব আত্মীয়-স্বজন থাকবে না! সে তো বংশের ছেলে, নিয়েছে তো কী হয়েছে? তোমার মাসিমা বোঝেই না, আমার বাবা এ-দেশে পাকিস্তান থেকে চলে আসার পর কী সসেমিরা অবস্থায় পড়েছিলেন। সম্বল যা ছিল তাই দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বাখারি ঘর তুলে আমরা ছিলাম। আমি সেজছেলে, বড়দা সেই কবে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গেছেন, পুণেতে থাকতেন— বিয়েও করেছেন, বাড়িতে এলে তার অভাবের কথা শুনতে শুনতেই আমার মাথা ধরে যেত। বাড়িটাতে মেলা শিশুগাছ ছিল— গাছ না বলে বৃক্ষই বলা যেতে পারে, বাবার সেই চরম দুরাবস্থার মধ্যেও গাছ বিক্রি করে টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। কোথায় রিফিউজি মা-বাবা ভাই-বোনদের জন্য অর্থ চিন্তার সুরাহার কথা ভাববে, তা না তিনি, বাবাকে দিয়ে গাছ বিক্রি করে টাকা হাতিয়ে নিয়ে চলে যেতেন।
আপনি নাকি এখনও ভাই-বোনদের কষ্টের কথা জানতে পারলে লুকিয়ে টাকা পাঠান— মাসোহারা দেন। আপনি পণের বিরুদ্ধে কথা বলেন, অথচ ভাইঝির বিয়ে হচ্ছে না— দাদাদের বললেই আপনার নাকি মতি স্থির থাকে না— কাউকে না জানিয়ে পণের টাকা বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা—
দেব না। শত হলেও নিজের ছোট ভাই!
তার একমাত্র মেয়ের পণের জন্য বিয়ে হবে না! আমি বেঁচে থাকতে এটা হতে পারে বল! ছোটভাইটা কি করে জানো?
না। আমি জানব কী করে। আপনার বাড়ি ভাগ্যিস গেছিলাম— মাসিমা কী খুশি! কী সুন্দর দেখাচ্ছে ঘরটা। মাসিমার অভিযোগ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে বলে যাচ্ছি, লেখার জন্য তুমি একটা ঘর বেছে নাও। বড় টেবিল কিনে নাও এ-ভাবে লেখা যায় বল! একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখেন। কোমরে আজকাল আবার স্পন্ডেলাইটিস, কিছুতেই কিনলেন না।
তিনি বললেন, তুমি বসো সুরমা। তুমি তো বলতে বলতে হাঁপিয়ে যাচ্ছ। কোথায় গেলে কিছু জানি না— স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যদি ফেরো। আসার সময় বাণীব্রতর জন্য একটা ছবির বই নিয়ে এলাম, রঙের বাক্স নিয়ে এলাম, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য এই দিয়ে শান্ত রেখেছিলাম।
ছোটভাই কী করে?

কী করে! তবে চুরি করে না। বাসস্ট্যান্ডে ফল বিক্রি করে। ফল বিক্রি করে একটা সংসার চলে বলো। আমার মন মানে না! তাই দিই।

মাসিমা তো বললেন, সেই নাকি আপনার পৈতৃক ভিটা দখল করে নিয়েছে। তার দুই ছেলে পাকা ঘরও তুলেছে— তাদের তো আর অভাব নেই।

অভাব নেই! কি কাজ করে জানো!

কী কাজ!

একজন রঙের মিস্ত্রি, আর একজন লেবারের কাজ করে। তারই মধ্যে বিয়েও করেছে। বাপের সঙ্গে থাকে না।

সেই। ছোটভাইটা আমার মুখাপেক্ষি— তাকে তো বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। পঞ্চাননতলার মোড়ে একটা মুদিখানার দোকান হয়েছিল তার। সে পাড়ার একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে। বাড়ি গিয়ে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। বাবাকে বললাম, এটা ভাল দেখাচ্ছে! আপনার মাসোহারা দরকার হয় বাড়িয়ে দেব। ওকে ডেকে বলেছি, সে এই বাড়িতেই ঘর তুলে থাকুক। বাবা কী করেন? আমি তাঁর কৃতী ছেলে, সব দায় যেন আমার, উঠোনের এক কোণায় ঘর তুলে সে উঠে এল।

আর সে তার পৈতৃক ভিটা সবটা দখল করে নিল। সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বলায় তিনি যেন আহত হলেন।

ইস তোমার মাসিমা কী যে করে না। আরে পৈতৃকভিটা দখল করবে কেন। ছেলে দুটো মানুষ হয়নি, মেজভাই চিঠি দিল— সে অবশ্য আগেই পাড়ায় জায়গা নিয়ে একটা পাকাবাড়ি করে আছে। সেই জানিয়েছে— বন্টননামা না করলে প্রায় সব জমিটাই নাকি ছোটভাই দখল করে নেবে। তুমি কবির স্ত্রী সুরমা, এখানে ছোট্ট বাড়ি করতে হবে। কবির বাড়ি লেখা থাকবে। সুন্দর হবে না!

কবির বাড়ির কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। মাসিমা ঠিকই বলেছেন, যে মানুষটা তাঁর জন্মদিন পালন করতে দেয় না, মাথা খারাপ না হলে হয়। একবার তো তাঁর জন্মদিন পালনের জন্য গোপনে কিছু কাছের মানুষদের, ক্ষেপে গেল— সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তিনি বললেন, পায়েসের গন্ধ। ও কতদিন পর পায়েস।

ছেলে মেয়েরা বলল, বাবা তোমার জন্মদিন।

জন্মদিন আমার কবে কেউ কি জানে?

জন্মালেই জন্মদিন হয়ে যায়। ভ্রূণে যখন প্রাণ সঞ্চার হয়, সেদিনটাই একমাত্র জন্মদিন হতে পারে। কেউ জানে। আমার বাবা মা জানেন। করছ করো— তবে আর যেন করো না। মানুষের, শুধু মানুষের কেন প্রাণীদের বেলায়ও কোনও জন্মদিন স্থির করা যায় না। আসলে, লোকজনদের ঠাঁট দ্যাখানো আমি পছন্দ করি না।

মাসিমা বললেন, তোমার বাড়িতে যিনি পালিয়ে আছেন, তাঁকে বলবে কালই যেন তিনি চলে আসেন। লোক হাসিয়ে লাভ নেই আর তাঁর তো এক কথা, নদী নারী নির্জনতা— জীবনের সব কিছু। এই বয়সে সেই নদী আর নির্জনতা পাবেন কোথায়! আর নারী! কত বয়েস হয়েছে জানে না!

বাবু আপনার কত বয়েস।

বয়স দিয়ে কী করবে। তার পাশে বসলে এই ভাঙা রেকর্ডখানা রোজ চালিয়ে যাবেন। কাহাতক আর ভাল লাগে বল!

না মাসিমা যে বললেন, আর নারী! কত বয়েস হয়েছে তিনি জানে না।

সুরমা, ভালবাসা বয়েস মানে না। আবার ভালবাসা দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। দীর্ঘস্থায়ী হলে ভালবাসা পচে যায়। মুক্তি চাইবে, কোথাও যাবার ইচ্ছা হবে— সময় ধরে অথবা চুক্তিবদ্ধ হয়ে কোনও ভালবাসাকে ভালবাসা বলে কিনা আমি জানি না।

একদিন তিনি বললেন, একটা কথা বলব সুরমা?

একটা কেন একশোটা বলতে পারেন।

তুমি কিন্তু ইচ্ছে করলেই, একটা ভদ্রস্ত কাজকে প্রফেশন হিসাবে গ্রহণ করতে পার। এত রাতে ফিরলে চিন্তা হয় না?

সুরমা মাথা নিচু করে রেখেছে।

তুমি ইচ্ছে করলে আমার কাগজে কাজ নিতে পার। ভাল মাইনে।

পারব না।

কেন?

অভ্যাস।

এই যে মাঝে মাঝে এত রাত করে ফের, আমার কষ্ট হয়।

আমারও কষ্ট হয়। বয়স আমারও কম হয়নি বাবু মনে রাখবেন। একটা বাধা

স্কুলে যাওয়ার সময় বাণীব্রত সোজা তার দাদুর ঘরে চলে আসে।

ধরা কাজ থাকলে সুবিধাই হয় বুঝি। কিন্তু শরীর মানে না। শরীর আর মনতো এক থাকে না। না বের হলে পাগল পাগল লাগে। আর আপনি দয়া করে করুণা করবেন না।

তুমি কি কবির উপর প্রতিশোধ নিচ্ছ।

না। কারও উপর প্রতিশোধ নেবার কথা আমি ভাবিই না!

তবে।

আমি আমার জন্যই বের হই। আপনি অনেক করছেন। আপনি আমার সংসারের দায়ও নিয়েছেন। কিন্তু আমার একাকীত্ব, তার কী হবে। আপনার করুণা থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

তোমার তো বাণীব্রত আছে। তার কথা ভাববে না!

কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করে না। করলে আপনি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন কেন! আমার মতো রাস্তার মেয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ারই কথা নয়।

তিনি বললেন, রোজ কিংবা সারাদিন বলতে পার, একই ভাঙা রেকর্ড বাজলে তুমিও পারতে না। তুমি বলছ, অরুন্ধতী ভাল হয়ে গেছে। বাবা বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেছেন শুনে কান্নাকাটি করছে। আমি বাবার কাছে যাব। অ্যাসাইলাম থেকে তাকে ছেড়ে দেবে বলেছে।

ওকে কে আনতে গেছে।

ওর বর যাবে বলেছেন।

অরূপ যাবে!

তাই তো মাসিমা বললেন। মাসিমাও তো কান্নাকাটি করেছেন— তোমার এত অভিমান— আমার দিকটা দেখলে না! এক বিন্দু শান্তি দাওনি। বিয়ের পর থেকে জ্বলছি। তিনি যেন আমার কেউ না। তিনি সবার। খোটা দিয়ে কথা, আমি তাকে বলেছি, শাশুড়ি ননদ, এমন কী যে এই ছোট ভাইটা তাঁর, সবাই তো আমার কাছেই থেকেছে। তার অফিসে কাজও দিয়েছিলেন। দশবছর তার মর্জি বুঝে আমাকে চলতে হয়েছে। আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনওই দাম তিনি দেননি। বউমারা যে যার মতো তাদের স্বামীকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে গেছেন। তার মেজভাই ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিলেন, পড়াশোনা করিস না, দাদার কাছে চলে যা। এক নাগাড়ে সাত বছর, হায়ার সেকেন্ডারিতে ফেল মেরেছে, আর এখানে এসে তার জ্যাঠাকে বলেছে, সে বিকম পাশ। সব মিথ্যে কথা। তিনি কিন্তু কিছুই তাকে বলেননি। ফোটোগ্রাফি। বাপ তার কাঁধে একটা ক্যামেরা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তিনি তাঁর এক ডিরেক্টর বন্ধুকে ধরে বললেন, দ্যাখো না চেষ্টা করে। তোমাদের তো ক্যামেরাম্যান দরকার হয়, যদি হয়

ছেলেটার, তবে ওর একটা রাস্তা খুলে যায়— সব শকুনের পাল জানো। চোখের অপারেশন— এখানে চলে এস। পেটে ব্যথা, মুখে ঘা, সব দলবেঁধে আসত। তাঁর অপরাধ মেজপুত্র ডাক্তার, তার পিসেমশাই পিসিমা, অমুকের নাম করে এসে উঠত। এই বাড়িটায় এসে উঠলে আর কেউ যেতে চায় না। আর কলকাতায় যত তার আত্মীয় আছে তাদের খোঁজখবর নিত। একবারও জিজ্ঞেস করত না, আমরা কেমন আছি। বল, সুরমা খারাপ লাগে না! এই যে তার আত্মীয় স্বজন, কেউ তার একটি লেখাও পড়ে দেখেনি। যত সব শকুনের পাল। স্বার্থ না থাকলে কেউ তাঁর খোঁজ নেয়!

তিনি সুরমাকে বললেন, সেই ভাঙা রেকর্ড তোমাকে শুনিয়েছে। ইস কী যে হবে না! ওঁর মাথাটাই গেছে। এটা ঠিক ওরা মিছে কথা বলে অনেক টাকাও আমার হাতিয়েছে। অশান্তির ভয়ে সবাইকে গোপনে নানাভাবে টাকা দিয়ে সাহায্যও করতে হয়— এত ছোটখাট বিষয় মাথায় রাখলে চলে! তুমি বলো, সবই তো এক জন্মের রহস্য— ঠিক কি না!

তিনি বললেন, আমি এখনও একজনকে খুঁজছি— এত অনুষ্ঠানে যাই, কোথাও তাকে খুঁজে পাই না। আমি তারই খোঁজে আছি।

সে কে?

একজন পাঠিকা।

আপনাকে চিঠি লিখেছিল।

চিঠি লিখলে তো তাকে খুঁজে পাওয়াই যেত। চিঠি লেখেনি। সকালের দিকে মাঝে মাঝে ফোনটা দু' তিনবার রিং বেজে থেমে যেত। করিডোরে ফোন, ঘর থেকে বের হয়ে ধরারও সময় পেতাম না। জানো, আমাকে আজকাল পাঠক পাঠিকারা ছাড়া বিশেষ কেউ ফোনও করে না। তোমার মাসিমার ভয়ে কেউ আর যোগাযোগও রাখে না।

কী হল তারপর?

আর বল না, ধরে ফেললাম।

ফোন ধরে ফেললাম। আর ধরতেই মেয়েটা আমতা আমতা করছিল।

সুরমা ভাবল, যাক তার সেই ফোনের কথা মনে আছে।

সুরমাই বলল, আমি বলছি, আপনি শুনুন।

বল।

বাড়ি বৈঁচির কাছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলছ।

বৈঁচি থেকে এক ক্রোশ হেঁটে যেতে হয়। মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বলেছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

বলেছিল আপনার বই পড়ে আটবছর ধরে খুঁজছে আপনাকে। আপনার ঠিকানা খুঁজছে। বইটা পড়ে আটবছর সে শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলেছে সারাদিন। তখন ক্লাশ এইটে পড়ে। কি ঠিক কি না!

তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন।

আমিই আপনার মনিকা, আপনার বই পড়ার পর, পাখি প্রজাপতি ফুলের সঙ্গে কথা বলেছি— তোমরা জানো তাঁর ঠিকানা?

আমি তো আপনার এই ঠিকানা চাইনি বাবু।

তিনি বলেছিলেন আমাকে আবার ফোন করে সে বলেছিল।

সুরমা বলল, ফোন আর সে করেনি। তার আগেই সত্যব্রতের ছলনায় সে হারিয়ে গেল। সে কবির স্ত্রী হয়ে গেল।

ছলনা বলছ কেন, যথার্থ ভালবাসা বল। তুমি কবির স্ত্রী সোজা কথা! কবিতা তো হৃদয় জুড়ে থাকে। ভিতরে ভালবাসার হাহাকার না থাকলে কবি হওয়া যায় না। কবি হওয়া সহজ কথা নয়। আর যাই কর সত্যব্রতকে অপমান কোরো না।

আপনারা সবাই স্বার্থপর বাবু। আমি বুঝি আপনার পারিবারিক পরিমণ্ডল আপনাকে সহজ হতে দিচ্ছে না। আপনি আমাকে ঘৃণা করেন।

তুমি এ-কথা বলতে পারলে!

পারব না। আমার সঙ্গে আছেন, অথচ এত নির্লিপ্ত, যেন আমি স্পর্শ করলে আপনাকে স্নান করতে হবে। আপনার তো সেই বয়স হয়নি। বলে সুরমা কাঁদতে থাকল।

কাঁদছ কেন!

কাঁদব কেন। আপনি আমাকে মনে মনে একটা বেশ্যা মেয়ে ভাবেন।

না বেশ্যা তুমি নও। তুমি উর্বশী। তুমি ঠাকুর দেবতা মানো, উর্বশীরা কখনও খারাপ হতে পারে! নারী-পুরুষের মিলনের কথা যদি ভাব, তবে খারাপ ভালর বিচার থাকে! যে-কোনও মিলনই পবিত্র। তোমাকে আমি ঘৃণা করতে পারি! ঘৃণা করলে, আমি এ-বাড়িতে থাকতে পারি। সারাদিনের পর দেখা হলে তোমার মিষ্টি হাসি আমাকে পাগল করে দেয় জানো। দ্যাখো না কিছুদিন না বের হয়ে। এই অভ্যাস থেকে মুক্ত থাকতে পার কি না।

একরাত গেল, দু-রাত গেল, তারপর আরও রাত— অপেক্ষা। অনেক রাত।

সুরমার আলাদা ঘর। বাণীব্রতর ঘরও এখন আলাদা। সুকুমারী থাকে তার ঘরে। আর শুধু অপেক্ষা।

সকাল হলেই সুরমার গঞ্জনা, কেন এ-বাড়িতে থাকা। কে বলেছে থাকতে! আমি কী কারও খাই না পরি। এত হিতোপদেশ আর সহ্য হয় না। তাঁর অফিসে আমি কাজ করি কেউ বলবে!

সহসা সুরমা এক রাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে গেল। বলল, আজকে আপনাকে শেষই করে দেব।

তিনি সুরমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললেন, তাই দাও। তারপর দু'জনই শরীর নিয়ে স্বপ্ন হয়ে গেল। ঈশ্বরের এই অযাচিত দানে কোনও আর মালিন্য থাকে না। দু'জনের মধ্যে আশ্চর্য এক প্রফুল্লভাব ফুটে উঠে। সুরমার আর সন্ধ্যায় বের হবার কথা মনে থাকে না। সে বাবুর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কবে তিনি ফের আসবেন। কে জানে।

পরদিনই সকালে বললেন আমি বাড়ি যাচ্ছি। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো। যে-কোনও দিন আবার ফিরে আসতে পারি।

আসলে, এই অপেক্ষাই হল সার কথা।

এই অপেক্ষাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

তিনি ফের কখন আসবেন। এই অপেক্ষায় থাকতে থাকতে সুরমা এক নতুন জীবনে ঢুকে গেল। বাণীব্রতকে নিয়ে সময় কেটে যায়। আর দেরি করে ফিরে আসে না। বাণীব্রতর জন্য খুবই চিন্তায় থাকে। আর তিনি যখন আসবেন বলেছেন, তখন ঠিকই আসবেন। এ-বাড়িতে তিনি আর এলেন না। অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাইতে পারত। কিন্তু সুরমার সাহস হয়নি।

একদিন অফিসে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সুরমা যথেষ্ট উৎকণ্ঠা নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতের ঢুকল।

তিনি কেমন যেন উদাসীন চোখে মজা দেখে যাচ্ছেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, বাণীব্রতর কোন ক্লাস হল।

এবার এইটে উঠেছে। আচ্ছা সত্যব্রতকে তোমার মনে পড়ে না!

পড়ে।

তোমাদের মণিদা কি স্মরণ সভায় মিছে কথা বলেছিলেন! সত্যব্রত আত্মহত্যাই করেছে।

সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ভুজঙ্গ তাঁকে অযথা গালাগাল করল!

ওর কথা বাদ দিন বাবু।
সেই। জানা হয়ে গেলে আর রহস্য কী!
কবিতা বল প্রেম বল সবারই থাকে অভ্যন্তরে ডাকপিওন। যার হাতে সব সময় নীল খামে চিঠি। সত্যব্রত টের পেয়েছিল, তোমাকে কেউ নীল খামে চিঠি দিয়ে যায়। টের পেয়েছিল, সত্যব্রতর নীল খামটা খালি! আসলে, নারীদের সঙ্গে দেখা হোক কোনও পান্থনিবাসে। একবারই। তারপর যেন আর না হয়। আমি তোমার মাসিমার কাছেই আছি। এখন আর তাঁর কোনও গঞ্জনা নেই। তাঁর আর সেই রুদ্রমূর্তি নেই। এখন যেন সে শান্ত এবং নিরীহ বালিকা। মাসিমা তোমার কথা খুব বলে। ভাগ্যিস মেয়েটা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তোমার পাগলামি সে হয়তো কতবার সহ্যও করেছে।
সুরমা মাথা নিচু করেই বসে আছে।
সুরমাকে দেখতে দেখতে বাবুর কেন যে মনে হল, এখানেই সেই নদী নারী এবং নির্জনতা। আবিষ্কার করেছিল বলেই তার সঙ্গে চলে গেছিল। আবার সেইসব ভেঙে দিয়েছে। তারজন্য আপাতত আর ডাকপিওনের নীল খামের চিঠিটা নেই। চিঠি এলে ফের দেখা যাবে।
ঠিক আছে, বলে তিনি উঠে পড়লেন। তারপর বললেন, অফিসে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো!
না। আজ্ঞে না।
তিনি দেখলেন, একদিন সুরমা দরজার মুখে।
সে বের হয়ে যাবে।
তিনি ফের ডাকলেন শোনো।
তিনি নিজেও বসলেন।
সুরমা ফিরে এসে সামনের চেয়ারে বসল।
তিনি তার দিকে তাকিয়েই আছেন। কিছুই বলছেন না।
তিনি না বললে, সে যেতেও পারে না। তার টেবিলে যে টেলিপ্রিন্টার থেকে কপি জমা পড়ছে, কারণ তার কাজ, কপি বাছাই— কোনও প্রয়োজনীয় খবর যেন বাদ না যায়, আবার অযথা খবরও কেন বলব— এডিটরদের টেবিলে জমা না পড়ে, খুব বেশি কপি থেকে খবর বাছাই করতেও অসুবিধা, আগে সে কোন খবরের কী গুরুত্ব বুঝত না, তিনি তাকে হাতে কলমে কাজ না শেখালে, সে এতটা দক্ষ হয়ে উঠতে পারত না, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।
আবার মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি খুবই চতুর এবং ধূর্ত, তাকে কাছে আটকে রাখার জন্যই একেবারে তার নিজের অফিসে তুলে এনেছেন, কে তিনি, কেন তিনি, জীবনে এতটা জায়গা দখল করে নেবেন, সে কি কখনও ভেবেছিল!
সুরমা বসেই আছে।
তিনি ফোনে কথা বলছেন, সম্ভবত অফিসের কোনও রিপোর্টারের সঙ্গে—
হ্যাঁ বল।
একটা খুনের খবর কভার করতে গেছে এমন কোনও রিপোর্টার। স্ত্রী, স্বামীকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীর মুখে বিষ ঢেলে দিয়েছে, তাদের একটি সন্তানও আছে—
তিনি বললেন, সুজয় সঙ্গে আছে তো!
আছে।
সুরমা সুজয়কে বিশেষ ভাবেই চেনে— কাগজের ফোটোগ্রাফার।
ছবিগুলি একটু দেখেশুনে নেবে। মনে রাখবে ঘরের ভিতর খুন, অদৃশ্য কোনও জিঘাংসা থেকে এই খুন হয়। ভালবেসে মা-বাবার মুখ পুড়িয়ে অন্য কাস্টে বিয়ে, এই তো পরিণাম।
তুমি বসে আছ সুরমা, কিছু বলবে।
আজ্ঞে আপনি তো ডাকলেন। কী বলবেন যেন।
তাই। ভুলেই গেছি, কেন যে তোমাকে ডাকলাম, এবারে তো বাণীব্রত বড় হচ্ছে। কতকাল তাকে দেখি না।
সুরমা চুপ করে থাকল, খুবই মিছে কথা— সে জবাব দিল না।
তারপরই বললেন, বাণীব্রতকে নিয়ে এস একদিন। আমরা একসঙ্গে কোথাও খাব। কতদিন দেখি না বাণীব্রতকে। ওকে কতদিন দেখি না।
সুরমা জানে মানুষটা যে কি এত ভাবে, আবার ভুলেও যায়। সে দোষও দিতে পারে না।
আচ্ছা সুরমা, আগে তো আমার লেখা সম্পর্কে তোমার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ছিল কি না বলো।
হ্যাঁ ছিল।
এখন নেই।
থাকবে না কেন।
কই তুমি তো আমার হাল আমলের কোনও লেখা সম্পর্কেই প্রশ্ন কর না। ভাল কি মন্দ, কিংবা কিছু হয়নি, এমনও তো বলতে পার।
সে বলতে পারত, আপনি বনেদি লেখক। বনেদি না বলে অভিজ্ঞ বলাই ভাল বোধ হয়। বনেদি কেন হতে যাবে।
আসলে কি জান, লেখক নিজেও জানেন না তিনি কী লিখছেন, আসলে লেখা হয়ে ওঠে।
আজ্ঞে আমি যাই।
তুমি যাবে!
সব তো জমা হচ্ছে।
তারপরই কেন যে কথাটা মাথায় এল সুরমার সে বনেদি ব্যাখ্যা, আর তিনি বনেদি লেখক। কার সঙ্গে কী, তার যে এই জন্যই বনেদি বলা উচিত নয়, অভিজ্ঞ বলাই ভাল— তবে তিনি তো বুড়ো নন। তিনি তো যৌনতার স্বাদ কী করে নিতে হয় জানেন। সে তো তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছে।
এত তাড়াতাড়ি হয় না। আমাকে খুন করো আর যাই করো, ধীরে ধীরে নিজের এই মহার্ঘ আয়োজনকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য সময়ের দরকার হয় বোঝার চেষ্টা করো।
জানো সুরমা, যৌনতা হল প্রাণীজগতের অবধারিত নিয়তি। আর মহান এই বিধিলিপি প্রকাশে মানুষ তাকে নানাভাবে সৌন্দর্য দিয়েছে, নাচে গানে সঙ্গীতে সাহিত্যে নিখুঁত বর্ণনা, এবং বলতে পার পূজার মতো। পরিষ্কার রাখতে হয় গৃহটিকে— আমার লেখার ঘরের মতো আবর্জনার স্তূপ হয়ে থাকলে যৌনতায় সৌন্দর্য নষ্ট হয় বোঝো!
সুরমা কিছু বলছে না। বলছে না, তাঁকে সে কিছু না বলে সম্মান জানাচ্ছে, অর্থাৎ তিনি এই অফিসের একেবারে শীর্ষে আছেন বলে তাঁর সঙ্গে এই ধরনের আলোচনায় কেন যে আগ্রহ বোধ করছে না। কিংবা সহজ হতে পারছে না।
উঠছ কেন? বোসো না।
কাজ জমে যাচ্ছে।
বোসো।
বেল টিপলেই তাঁর বেয়ারা হাজির।
সতীনাথকে আসতে বল।
সুরমা বুঝতে পারল না, সহসা সতীনাথকে কেন ডেকে পাঠাচ্ছেন।
সতীনাথ এলে বললেন, তুমি এসেছ। শোনো, সুরমা এই মুহূর্তে যেতে পারছে না। কপিগুলো তুমি টেবিলে টেবিলে দিয়ে দেবে।
সতীনাথ বসলও না। সুরমাদিকে তাঁর ঘরে আটকে দিয়েছেন। তাঁর মেলা গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে। অথবা সম্পাদকীয় লেখার জন্যও বসিয়ে রাখতে পারেন।
সুরমাদির মধ্যে যে একটা আশ্চর্য মুগ্ধতা আছে সেও টের পায়।
অফিসে সুরমার এত বেশি রুচিসম্মত আচরণ এমনকী সে জোরেও কথা বলে না। নিজের জন্য চা-এর অর্ডার দিলে সবার জন্যই চা আনায়। জলখাবার নিয়ে আসে নানা রকমের, এবং টেবিলের চার পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করেও খায়। এটা হল তার সামাজিক আচরণ, কেউ জানেই না, সুরমা একজন কবির স্ত্রী। কবি আত্মহত্যা করেছেন— না অসুখে ভুগে মারা গেছেন— এই নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। তবে সুরমা মিষ্টি স্বভাবের বলে সবাই তাকে পছন্দ করে।
সুরমাকে দেখে তাঁর এমনটি মনে হবার সময়ই তাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন মনে পড়ে গেল।
আজকের সকালের কাগজ পড়েছ সুরমা।
সুরমার অবশ্য অফিসের এত তাড়া থাকে— তা-ছাড়া বাণীব্রতকে বাসে তুলে দেবার বিষয়টিও মাথায় থাকে— যার ফলে কাগজে চোখ বুলানো ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।
খুনের খবরটা পড়েছ!
ছবিটা দেখেছি। পড়া হয়নি।
তিনি তার ড্রয়ার থেকে শহর সংস্করণের কপিটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়।
সুরমা বুঝতেই পারছে না, এই খবরটা তার পড়ে কী লাভ হবে। এ তো নিত্য খবর— খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির খবর পাঠকেরা খায় ভাল। কাগজগুলিও আজকাল এইসব খবরগুলির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।
কাগজটা পড়ে ভাঁজ করে তাঁকে আবার ফেরত দিলে, তিনি বললেন, কী বুঝলে!
নতুন কিছু না। বিস্মিত হবার মতোও খবর নয়।
সে-জন্য পড়তে বলিনি।
তবে কী জন্য পড়তে বললেন এমন প্রশ্ন সুরমা করতেই পারত। খুনের খবর, ভালবাসার খবর, মেয়েটি প্রেমে পাগল হয়ে একজন অন্য কাস্টের ছেলেকে বিয়ে

করে। তাদের একটি পুত্রসন্তানও হয়। পুত্রসন্তানের ছবিটি কাগজে বড় হরফে ছাপা হয়েছে।

কিছু বলছ না যে!

কী বলব!

সুরমা ভাবল, তার জীবনের সঙ্গে কি মেয়েটির জীবনের কোথাও মিল আছে এমন তিনি টের পেয়েছেন— এই যে তার প্রতি তিনি এত নির্লিপ্ত, এই বিপদ-শঙ্কাই কি কারণ। সে তো স্বপ্নেও ভাবে না, তারপরই সুরমার প্রশ্ন— মেয়েটি কি নিজেও ভাবত।

আসলে, ভালবাসাও একটা স্বপ্ন।

বুঝলাম না। সুরমা মাথা নিচু করেই বসে আছে।

আসলে, সুরমার মনে পড়ছে, তার বাড়িতে তিনি এতই শরীর সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিলেন, যে তার আর কোনও গতি ছিল না। শরীরের উত্তেজনায় সে অধীর হয়ে পড়ত। তারপর রাতে সে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকত, এক আশ্চর্য আধার যদি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মাথা ঠিক থাকে না।

সে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছিল। সুইচ টেপেনি, আলো জ্বালেনি। অন্ধকারে বিড় বিড় করছিল, আমাকে নিয়ে এত তামাসা! আমি এত অস্পৃশ্য— আজ খুনই করে ফেলব।

আসলে তাঁকে জাগিয়ে দেবার জন্য প্রকৃতই কী বলেছিল সুরমার মনে নেই।

এইসব ভেবে কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেছে সুরমা। এবং তার দিকে তাকাতে পারছে না। তিনি যে উঠে বসেছেন, তাও টের পেয়েছিল, তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এবং ধীরে ধীরে সেই নদী নারী নির্জনতার আমোদে বিভোর হয়ে গেছিলেন। তাঁর তখন স্ত্রী পুত্র পরিবার কিংবা তার প্রিয় কন্যা অরুন্ধতীর কথাও হয়তো মনে ছিল না। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য এই যৌনক্রীড়াকে সাধুবাদও জানিয়েছিলেন তিনি।

সুরমা না বলে পারল না, কেন ডেকেছেন বাবু।

তিনি বললেন, আমি আজ যাব তোমার সঙ্গে। বাণীব্রতকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

কাগজের খবরের সঙ্গে সুরমার তবে কোনও সম্পর্ক অথবা খুনের সঙ্গেও না।

সকালের খবর, অর্থাৎ খুনের খবর দেবার জন্যই যেন ডেকেছিলেন। কোথাও মিল খুঁজে পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

কারণ তারও একটি পুত্র, স্বামী নেই। সত্যব্রত আত্মহত্যা করেছে, সুরমা বলতে চেয়েছিল, সে তো স্বামীর গলায় বিষ ঢেলে দেয়নি! তার জীবনে এই খবরের মিল অমিল কতটুকু সে বুঝতে পারছে না।

আসলে মানুষটা সব সময় যেন তার দুর্বলতা আবিষ্কারের চেষ্টায় থাকে।

তারপরই মনে হল, সেই রাতে যখন সে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে গেছিল, তার সত্যি কোনও হুঁস ছিল না— খুন করব এবার, বলতেও পারে। এই খুন আর কাগজের খবরের খুন কী এক।

আসলে নানাদিক থেকেই সুরমা নিজেকে যাচাই করছে।

সে উঠে চলে যেতেও পারে। কিন্তু উঠলেই বলবেন, তুমি উঠছ। আর একটু বোসো না।

এই আকর্ষণ সুরমারও আছে। তিনি কাছে থাকলে তার ভাল লাগে। এটা সেই বইটা অর্থাৎ তার প্রথম দিককার একটা বই যা পড়ে সে আট বছর অপেক্ষা করেছিল— যদি লেখকের ঠিকানা পাওয়া যায় এবং এতই বিভোর ছিল, যে ষাটবছরই লেখকের সঙ্গে গোপনে কথা বলেছে।

সুরমা বলল, যাবার সময় আমি কি গেটে অপেক্ষা করব?

না, না।

তবে!

রবীন্দ্রসদনের সামনে হলে ভাল হয়।

তারপর, কী ভেবে ফের বললেন তিনি, আমার ঘরে চলে এস। দু'জনেই একসঙ্গে বের হব।

সুরমা এতটা আশা করেনি। কতকাল পর যেন ফের সুরমার উপগত হওয়ার সুযোগ হাতে এসেছে।

মাসিমা জানে?

বলেছি, আজ আমি ফিরতে নাও পারি।

তারপর তিনি বললেন, তুমি কি জানো সুরমা, তোমার সঙ্গে গেলে তোমার মাসিমা মনে করে বিপদ আপদের আশঙ্কা কম।

সুরমা হাসল। খুবই ভালমানুষ।

ভালমানুষ তো বটেই, সরল সোজা, তবে কিছু গোঁ আছে। আমাকে কি বলেছে জানো, সুরমা বলেই তোমার পাগলামি সহ্য করেছে।

তোমার কি মনে হয়েছে, আমাকে সহ্য করা যায় না।

সুরমা একবার তাকাল শুধু। কিছু বলল না।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, তোমার দিদিমণির বাড়ি চলো।

সুরমা পিছনে বসল। ড্রাইভারের পাশে তিনি বসলেন।

মানিকতলার বাজারের পাশে তিনি গাড়ি থামাতে বললেন।

কোথায় যাচ্ছেন?

দেখি, ভাল ইলিশ মাছ পাওয়া যায় কি না। এবার তো বাজারে নাকি ইলিশের আমদানি খুব কম। বাংলাদেশের ইলিশ তো পাওয়াই যায় না— মানিকতলার বাজারে দুর্লভ সব মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ইলিশও পেয়ে যেতে পারি। পদ্মার ইলিশের কোনও তুলনা হয় না।

এবং দেখা গেল তিনি ফিরে এসেছেন, হাতে একটি পলিথিনের ব্যাগ।

পাওয়া গেছে। এবার তিনি দরজা খুলে সুরমার পাশেই বসলেন।

জানো সুরমা, আমার কাছে কেউ কিছু চায় না, আমার পুত্ররা তো নয়ই, বউমারাও না। নাতি নাতনিরা কাছেই ঘেঁষে না।

বাণীব্রত তো আপনাকে জ্বালিয়ে মারে। আমি এত বলি দাদাইকে এত জ্বালিও না, সে শোনে না। আমার বিরুদ্ধে তার মেলা অভিযোগ। আমাকে ভয় দেখায়, আসুক দাদাই, আমি সব বলে দেব।

কী অভিযোগ এত!

আমি নাকি রাতে লুকিয়ে কাঁদি।

লুকিয়ে কেন?

কী জানি— হয়তো স্বপ্নে কেঁদে থাকি।

একজন নারীর চাই অভিভাবক।

তিনি অভিভাবকের মতোই থাকতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু সুরমা সেই সুযোগ তাকে দেয়নি। ওরও দোষ নেই। শরীর বলে কথা! সুরমার ঠোঁটে আশ্চর্যরকমের মিষ্টি হাসি জড়িয়ে থাকে, তাকে দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়।

তিনি তাঁর ডেসকের অন্তরালে যে কপিটা রেখেছিলেন সেটি তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, জানো মাঝে মাঝে আমার স্মৃতিবিভ্রম হয়— কিছু মনে করতে পারি না।

অসুখটা তো ভাল না বাবু। ডাক্তার দেখাননি?

দেখিয়েছি। বলেছে কাজের মধ্যে থাকবেন— কাজ ছাড়া এই অসুখ থেকে আপনার মুক্তি নেই। আনন্দে থাকবেন। যখন যা ইচ্ছে হবে করবেন।

ডাক্তার বলেছে, লেখালেখি বন্ধ করবেন না। চালিয়ে যাবেন। কিন্তু মুশকিল লিখতে লিখতে শব্দ হারিয়ে ফেলি। সঠিক শব্দের খোঁজে থাকি। কিন্তু খুঁজে পাই না। কী যে খারাপ লাগে তখন। শোনো বউমাকে যে-জন্য ডেকেছি। বলে, তিনি কী খুঁজতে থাকলে, সুরমা বলল, এটা কি খুঁজছেন!

তিনি কাগজটা হাতে পেয়ে বললেন, এই তো সেই কাগজ। ইস্ দেখলে আমার সব কেমন বেমালুম ভুল হয়ে যায়। শোনো তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তোমার কাছ থেকে এই খুনের—

খুন মানে?

স্বামীকে রাতে বিষ খাইয়ে খুন করল না। পুলিশ রিপোর্ট তো তাই বলছে।

সুরমা দাঁড়িয়েই আছে।

পোস্ট এডিটোরিয়লে লেখাটা যাবে। ইচ্ছা করলে সঙ্গে তুমি সতীনাথকে নিতে পার। খুবই বুদ্ধিমান ছেলে, তাকে পাঠিয়ে দিও।

শোনো যেও না।

সুরমা ফের ফিরে এল।

লেখাটার বিষয় হচ্ছে, ভালবাসা কেন এত ভঙ্গুর। নারী পুরুষের সম্পর্ক, নারী পুরুষের ভালবাসার সম্পর্ক, এগুলিই লেখার বিষয় হওয়া উচিত। আমি মনে করি তুমি পারবে।

সুরমাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে।

তুমি পারবে। যেখানে অসুবিধা হবে বলবে। আমার সঙ্গে আলোচনা করে নেবে।

মনে রেখো, তুমি সুরমা নও। তুমি হৈমন্তি বললেও মানব না। আসলে তুমি মনিকা।

সুরমা অবাক?

বলছেন কী!

সে যে প্রকৃতই মনিকা। সেই যে তাঁর প্রথম দিককার একটি উপন্যাস পাঠ করে নিষ্পাপ এক প্রেমের জন্ম দিয়েছিল শরীরে তিনি জানলেন কী করে!

তিনি ফের বললেন, সব মেয়েরাই নিষ্পাপ। ভিতরে পুরুষের জন্য প্রতিক্ষা তীক্ষ্ণ হলে, শরীর উষ্ণ হয়ে ওঠে— এবং পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর প্রেম থাকলে সব যৌনতাই নিষ্পাপ মনে রাখবে। ঈশ্বরেরই ইচ্ছা সব। সেখানে কোনও পাপ থাকে না। সত্যব্রত তোমাকে ঠকায়নি, কবিরা প্রেমের জন্য একটু বেশি পাগল। যেখানেই থাক, সে শেষে তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছে। তাকে তুমি বার বার ফিরিয়ে দিয়েছ। কি ঠিক কি না।

মানুষটা যে এত ভয়ঙ্কর, দু' একটি কথা থেকে, তিনি বাকিটা বুঝে নিতে পারেন, গাড়িতে বসে এ-সব কথা সে শুনতে চায়নি— যেন ধর্মালোচনা করছেন। তার ড্রাইভার দিবাকর যদি শুনতে পায়, কী না ভাববে!

সে চিৎকার করে উঠেছিল।

আপনি থামবেন!

আমি তো কোনও দোষের কথা বলিনি, জীবনদর্শনের কথা বলছি।

তোমার গলার স্বরে মনিকার স্বর টের পেয়েছিলাম। প্রেমেই একমাত্র যৌনতার সন্নিবৃত্ত হয়। বোঝো মনিকা তখন ক্লাশ এইটে পড়ে। শরীরে তার জোয়ার আসছে— সে তখন নদী পাহাড়ের গিরিখাত ধরে নামছে— তার শরীরের লাবণ্য, আশ্চর্য সুঘ্রাণ পাচ্ছে নিজের মধ্যে— মনিকা স্থির থাকতে পারেনি।

থামবেন!

আমি কি খুব জোরে কথা বলছি। দিবাকর তুই শুনতে পাচ্ছিস!

না স্যার।

এই তো দিবাকর বলল, শুনতে পাচ্ছে না। আর শুনলেই কি তুমি কিংবা আমি খাটো হয়ে যাব, যা চিরন্তন তার আলাপে কোনও দোষ থাকে না।

আমি নেমে যাব। দিবাকর গাড়ি থামাও।

আরে তুমি নামলে চলবে কেন। ইলিশ মাছ ভাজা খিচুড়ি। বাণীব্রত খুব খুশি হবে। একেবারে পদ্মার ইলিশ। সব ফেলে তুমি কোথায় যাবে, জানো তো পদ্মার পাড়ে আমি বড় হয়েছি— পদ্মা মেঘনা, বর্ষায় সমুদ্র হয়ে যায়।

তারপরই কেন যে বললেন, মনিকা বৃষ্টিতে ভিজছে।

আপনি দেখেছেন, মনিকা বৃষ্টিতে ভিজছে! সুরমা ফের বলল, মনিকা বৃষ্টিতে ভিজবে কোন দুঃখে!

মানুষের দুঃখ থাকবে না। দুঃখ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে।

কেন পারবে না।

পারলে যে মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে যাবে। মানুষের হৃদয় বলে কিছু থাকবে না।

সুরমা বলল, মনিকাকে আপনি কতটুকু জানেন। আপনার সঙ্গে কি তার দেখা হয়েছে?

নিশ্চয় হয়েছে। আমার পাশে বসে আছে।

সুরমা সামান্য ঠেলা দিয়ে বলল, এবারে নামুন।

তিনি নেমে গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, মাছের ব্যাগটা দাও।

সুরমার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এই মানুষ অফিসে ডেকে পাঠালে সে চিন্তায় পড়ে যায়। খুবই ভয়ে থাকে, কী না জানি ভুল হয়ে গেল।

এটা কী হল?

কি, কাগজে ভুল ছাপা হয়েছে!

ভুল ছাপা হবে কেন। তুমি নিজে ভুল করেছ। ব্যাগটা দিবাকর নিজেই হাতে নিল। বাবুকে দিল না— এখান থেকে কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হবে। বাজার পার হয়ে একটা সরু গলি, তারপর একটা বন্ধ কারখানার পাচিলের পাশ দিয়ে কিছুটা এঁকেবেঁকে কলোনির রাস্তা যেমন হয়ে থাকে, যে যেখানে পেরেছে জমি দখল করে বসে গেছে। এবং কাঁচা নর্দমা পার হয়ে আরও কিছুটা গেলে সুরমাদির বাড়ি।

দিবাকর তোমাকে আর যেতে হবে না। আমাকে ব্যাগটা দাও। সুরমা ব্যাগটা নিয়ে হাঁটতে থাকলে তিনি বললেন, দিবাকর তুমি ফিরে যাও। আজ আমার ইচ্ছে মতো মাছ রান্না হবে— কালোজিরে সম্বারে জিরে বাটা ঝোল। ইলিশের প্রকৃত স্বাদ পেতে গেলে জিরে বাটা ঝোলই সব চেয়ে বেশি উপাদেয়। রাস্তাটা দিবাকরের চেনা, সে ফিরে যাবার সময় বলল, কাল স্যর ক'টায় বের হবেন!

সুরমার ভিতরে কিছুটা যে আহ্লাদ কাজ করছে, কারণ পোস্ট-এডিটোরিয়ল লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরদের দায়িত্ব লেখার— তবে কে কী লিখবে তিনিই ঠিক করে দেন। সহসা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়ায়, সে খুশিই, তবে এ-জন্য বিশেষ খাটাখাটনি আছে, তবে সতীনাথ সঙ্গে আছে, এই যা ভরসা। খুটিয়ে খুটিয়ে বউটির জবানবন্দি সেই নেবে। সতীনাথ কাছে থাকলে, সেই প্রশ্ন করবে, তবে বউটি কিছু বলতে রাজি হবে কী না, পুলিশ রিপোর্ট আর সরেজমিনের রিপোর্ট এক না হওয়ারই সম্ভাবনা।

কারণ, ঘুমের মধ্যে হাঁ করা মুখে বিষ ঢেলে দেওয়াও সহজ, শ্বশুরের বয়ান কিংবা থানায় অভিযোগও বলা যেতে পারে, তার পুত্রকে পুত্রবধূ ঘুমের মধ্যে মুখে বিষ ঢেলে খুন করেছে, মৃত্যুর আগে পরিবারের সবাইকে তার পুত্র জানিয়ে গেছে। বউটি পুলিশ হেফাজতেই রয়েছে। আগামীকাল কোর্টে হাজির করার কথা—

সে নিজে ফোন করে সতীনাথকে জানাতে পারত, আপনি সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু সে ফোন করে বললে বিষয়টা কিছু পরিমাণে লঘু হয়ে যেতেই পারে। তার চেয়ে তাঁকেই সুরমা বলবে, আপনি তাকে বলুন। আপনার কথা আমার কথা এক হবে কেন।

তারপর ভাবল, কথা নেই বার্তা নেই এমন একটা কাজের ভার তাকে কেন যে তিনি দিলেন!

সত্যব্রতের আত্মহত্যার অভিজ্ঞতা তার আছে জেনেই কি তিনি তাকে এই কাজটায় ডেপুট করলেন— আত্মহত্যা হলে স্ত্রীরও কিছু না কিছু দায় থেকে যায়— সত্যব্রত যে আত্মহত্যা করেনি— সে লিভারের অসুখে মারা গেছে—

এ-সব বিষয়গুলিই তার মাথায় কাজ করছে— অফিস থেকে ফিরে তার স্নানের অভ্যাসটি আগের মতোই আছে, দেখে সুকুমারীও খুব খুশি, তাঁর পছন্দমতো তিনি বাজার করেন, সুকুমারী যে দোক্তা খায়, বাজার থেকে ফিরেই ব্যাগ নামাবার আগেই দোক্তা পাতা সুকুমারীর হাতে ধরিয়ে দেবে— এই নাও। ভুলে না যাই, বাজারে ঢোকার মুখেই তামাকের দোকান থেকে তোমার জিনিসটি আগেই কিনে রাখি।

সুকুমারীও এতে খুব আহ্লাদে তৈরি হয়। তিনি কিছুটা যে ভুলো মানুষ সুকুমারী ভালই জানে।

এই সব নানাপ্রকারের ভুলভ্রান্তি থেকে তিনি তাঁকে মনিকা ভাবতে পারেন। এর ফলে কারও কণ্ঠস্বর মনে থাকারও কথা নয়, অথচ তিনি বলছেন তাঁর আছে।

তিনি বলেছেন, মনিকার মনের মধ্যে নানারকমের দ্বিধা ছিল। ফোনে তার নাম শুনেও তার বিশ্বাস হয়নি।

সত্যি আপনি সেই লেখক!

মিথ্যে হবে কেন।

অন্য কেউ যদি হয়।

না আমিই বলছি। জানেন আপনার বইটি পড়ার পর আটবছর ধরে আপনার ঠিকানার খোঁজে ছিলাম। আমি খুবই গ্রাম্য জায়গায় থাকি। কেউ বলতে পারেনি।

তিনি কি মনিকাকে নিয়ে একই কথা বার বার ভাবছেন!

ঘরে ঢুকে সুকুমারীকে ব্যাগটা দিলেন।

বললেন শোনো সুকুমারী আজকের রাতের মাছটা আমি নিজে রান্না করব। বাণীব্রতকে দেখছি না। মাঠ থেকে ফেরেনি। বাণীব্রত যে ফুটবল খেলে তা অবশ্য তিনি জানেন না, কতকাল পর যেন এখানে আসা।

বাণীব্রত ঘেমে নেয়ে মাঠ থেকে তখনই হাজির। বাবুটির কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, দাদাই এতকাল পর এলে। আমি বড় হয়ে গেছি মা জানে না। এখনও বাসে তুলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আসতে না আসতেই তোমার নালিশ শুরু হয়ে গেল! দাদাইকে বিশ্রাম করতে দাও।

তুমি সুরমা আমাকে সত্যি অবাক করলে দেখছি। সারাদিন তো বসেই থাকি। এত বিশ্রামেই হয়তো কাবু হয়ে যাচ্ছি। কার্যত অকেজো মানুষ না যেন হয়ে যাই।

তিনি ডাইনিং স্পেসেই একটা কাঠের চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তারপর দেওয়াল দেখলেন, এবং আলোর নানা বাহারও দেখলেন। তার নিজের বাড়ি নয়। আগের বাড়িটাও নেই। ঘরগুলি বেশ বড়। একটা ঘরে তাঁর ফোটো বাঁধানো আছে দেখতে পেলেন। পাশে আর একটি লম্বা মতো ফোটো চোদ্দো বছর বয়সের মনিকার। কী এক বিস্ময় ভরা চোখ, তিনি সুরমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য চারিদিকে কাউকে খুঁজছেন।

চোদ্দো বছরের বাণীব্রত বলল, আমার মা।

যেন তার মাকে খোঁজার আর দরকার নেই— তার কথাই শেষ কথা। কারণ বাণীব্রতই তার মাকে সব চেয়ে বেশি চেনে। তার চোদ্দো বছর থেকেই যেন চেনে।

তোমার মা কোথায় গেল!

টয়লেটে। আসছে।

ওর কি বার বার, তিনি আর ভাবতে পারছেন না। অফিস থেকে বের হবার

মুখেই তো বলল, আপনি এগোন, আমি আসছি— তারপর পিছন ফিরে তাকালে দেখলেন, সুরমা টয়লেটে ঢুকছে। পাশে বসে থাকলে সুরমা উষ্ণ হয়ে উঠতেই পারে। তিনি ভাবলেন, মেয়েদের কি কিছু গোপন থাকে না!

এসেই এত দ্রুত সুরমা বাথরুমে ঢুকে গেল কেন, এমন প্রশ্ন তাঁর পক্ষে শোভন নয়।

মা অফিস থেকে এসেই, ফ্রেস হয়ে বাইরে আসেন। বাণীব্রতই চেনে তার মাকে— তার কথা ফেলাও যায় না। আসলে অভ্যাস। সুরমা বের হয়ে আসছে। সে পরে আছে বাহারি একটা ম্যাকসি। ম্যাকসিটা তত লম্বাও নয়। হাঁটুর কিছু নীচে নেমে আছে।

বউদি, দাদা কী বলছেন!

কী বলছেন?

নিজে মাছ রান্না করবেন বলছেন।

ওঁর কথা বাদ দাও। আমরা থাকতে তিনি রান্না করবেন? তোমার কি মাথা খারাপ।

কতকাল জিরেবাটা কালো জিরে, সম্বারে ইলিশ মাছ খাওয়া হয়নি। মা জেঠিমারাও নেই— তোমার মাসিমার আবার কালোজিরায় এলার্জি আছে। কালোজিরে ফোড়ন দিলেই তার হাঁচি কাশি শুরু হয়ে যায়।

সুরমা তাঁর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো কালোজিরে সম্বারে জিরেবাটা দিয়ে হালকা ঝোল খাই। এটা কি কোনও কঠিন কাজ। আপনি করলে কি তার আলাদা স্বাদ হবে!

না তা বলছি না, আমার মা যা পছন্দ করতেন— আসলে আমরা এত বদলে যাচ্ছি।

মাসিমার সঙ্গে কি তিনি খারাপ ব্যবহার করতেন!

আমার মনে পড়ে না। আর মা তো দেশের বাড়িতেই থাকতেন। কখনও বছরে দু-চারদিন এসে থাকতেন। তার নাতি নাতনিরা তাকে জোর করে রাখার চেষ্টা করত। তবু তিনি থাকতেন না।

সুরমা একটা সোফা টেনে এনে বলল, বাবু আপনি এখানটায় বসুন। বাবু পাখাটা কি বাড়িয়ে দেব।

সুরমা ফের বলল, আপনিও ফ্রেস হয়ে আসুন। পাঞ্জাবি পা-জামা বের করে দিচ্ছি। কিছু খান।

এক কাপ চা দিতে পার।

আর কিছু না।

না।

সুরমা বুঝতে পারছে না, তিনি তাঁর অফিসের ক্লান্তি কী করে দূর করেন! আগে একরকম ছিলেন, এখন যদি অন্যরকম কিছু হয়—

দ্যাখো সুরমা তুমি আমার জন্য একটু বেশি ভাবছ। তোমার চোদ্দো বছরের ফোটো দেখলাম— চোদ্দো বছর— মারাত্মক সময়।

চোদ্দো বছর তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ফোটোতে সুরমাকে আশ্চর্য রকমের লম্বা মনে হচ্ছে, যাবতীয় নগ্নতার জ্যোতি থেকে সুরমা যেন উঠে আসছে— তার শরীরে আসন্ন এক কবিতা মেলা যেন হয়ে উঠছে। প্রকৃতির জলজ গন্ধ, চারপাশের নদীনালা থেকে সুবাতাস বয়ে আনছে— চোদ্দো বছর, শরীরে আশ্চর্য সব কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে— চোদ্দো বছর।

আপনি কি বাবু কবিতা আবৃত্তি করছেন!

করতেও পারি। চোদ্দো বছর। মনিকা তখন তোমার চোদ্দো, মনে আছে সব! চোদ্দোয় পড়লে তুমি, শরীরে তোমার আশ্চর্য ফুলের ঘ্রাণ পাচ্ছ— মনে আছে তোমার! তুমি বলেছিলে, ক্লাস এইটে পড়।

সুরমা বলল, ইস্ বাবু বাণীব্রত পাশের ঘরে।

থাকুক না, তারও তো চোদ্দো বছর, কী হয় সে তো ভালই জানে।

ঝড় ওঠে। এলোমেলো হয়ে যায় শরীর— যোনিদেশ স্ফীত হয় এবং করমচা ফুলের মতো সে বাতাসে উড়তে চায়।

সুরমা জানে তার এই পাগলামি— কিন্তু অফিসে মানুষটার দাম্ভিকতা, তাকে একেবারে অবহেলায় ভাসিয়ে আলাদা মানুষ তিনি।

বাবু আসুন।

কোথায়?

আসুন না।

সুরমা পাশের ঘরের দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে ডাকল, কী হল, কী করছেন, আসুন।

বাবু এখানে খোলা হাওয়া পাবেন।

বাণীব্রত সেজেগুজে বের হবার মুখে বলল, দাদাই তোমাকে মা ডাকছে।

তুমি কোথায় যাচ্ছ।

আমি, দাদাই এখন রহড়ার হোস্টেলে থাকি। সেখানেই যাচ্ছি। তোমার মাকে বলে এসেছ।

মা জানে।

মা-কে প্রণাম করেছ। শত হলেও তিনি জননী। বাড়ি থেকে বের হচ্ছ তাকে প্রণাম করে বের হবে না। তুমিও বড় হয়ে গেলে! তোমাকে হাত ধরে স্কুল বাসে তুলে দিতাম, মনে আছে!

বাণীব্রত টুক করে তাঁকে প্রণাম করলে বললেন, কী ভুলে গেছ।

না দাদাই, ভুলিনি। তোমাকে ভুলে গেলে আমাদের সব কিছুই ফের জলে পড়ে যাবে।

তোমাকে হোস্টেলে রেখেছে, আমি জানি না। সুরমাও বলেনি। হাতে করে মাছ নিয়ে এসেছিলাম, তুমি খাবে বলে। চলে যাচ্ছ!

সুরমা ডাকছে, আসুন— কী হল।

বাণীব্রত বলল, মা ডাকছে।

এরা তো জানে না, আশ্চর্য এক শূন্যতা থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে সুরমা।

সুরমা বলেছিল, আমার বাণীব্রত আছে আমি ভয় পাই না।

সেই বাণীব্রত বড় হয়ে যাচ্ছে।

এক শীতল সুবাতাসের ভিতর সে বড় হচ্ছে।

সুরমা ছুটে এসে বলল, কী হল, আরে দেখো না বাণীব্রত হোস্টেলে চলে যাচ্ছে।

তুই আজই চলে যাবি। তোর দাদাই কি ভাববে বল!

আমার রিহারস্যাল আছে না। তুমি তো জানো, কবিতার ঘ্রাণ, নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছে। আমি না গেলে মহারাজ রাগ করবেন। আমি তো জানতাম না, দাদাই আসবেন।

বাণীব্রত বলল, তিনি কখন যাবেন! দাদাই দু-একদিন থেকে যেও। আমি যাচ্ছি।

দাদাই এলে মা-র আনন্দের শেষ থাকে না। সে জানে, দাদাই খুব মুডি লোক। দাদাই সম্পর্কে নানা গল্প অফিসে চাউর হয়ে যায়। সে-সব গল্প বাড়ি ফিরে মা তাকে বলে। তবে হোস্টেল জীবন তার এই সবে শুরু। এবং সে বুঝেছে, মানুষ কখনও একা হয়ে যায় না, কাউকে না কাউকে সে কোথাও পেয়ে যায়। হোস্টেলে যাওয়ার আগে মাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে এমনও বলেছিল।

মা-কে ছেড়ে থাকা কি কঠিন!

মা বলেছিল, আমার কি কম কষ্ট হয়।

সেই। 'সেই' কেন, সুরমা বাবুর দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবু বললেন, তোমার বাগানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ! বাণীব্রত চলে যাচ্ছে, বাণীব্রতকে ভেবেছিলাম, পদ্মার ইলিশ খাওয়াব, পদ্মার ইলিশের মর্যাদা পর্যন্ত তুমি দিলে না বাণীব্রত। হাতে করে মাছটা নিয়ে এলাম।

আমার যে রিহারস্যাল। আমি না গেলে মহারাজ রাগ করবেন।

না না তুমি যাও। জীবনের সব প্রান্তেই একজন করে মহারাজ দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি রাগ করলে তোমার ক্ষতি হতে পারে।

তখনই আবার মনে করিয়ে দিলেন তিনি, আমি কিন্তু, জিরেবাটা ঝোল দিয়ে ইলিশ খাব।

খাবেন। তারপর সুরমা বলল, আমার বাগান আপনি দেখলেন না। কেমন ভ্যাপসা গরম।

চলুন না।

চল হৈমন্তি।

সুরমার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

বাবু আপনি মানুষকে মানুষ মনে করেন না।

ইস ভুল হয়ে গেল।

সে আর একটা কথা না বলে, নিজে ঘরে ঢুকে গেল। কখন যে বাণীব্রতও চলে গেছে টা-টা বাই বাই করে। তিনি একা, কার সঙ্গে কথা বলবেন, সুকুমারীকে ডেকে বললেন, তোমার বউদি কোথায় গেল!

শুয়ে আছে।

সত্যি ভুল হয়ে গেছে। হৈমন্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হৈমন্তি হৈমন্তি, না না অন্য নাম, নামটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি থেকে। কিছুই মনে করতে পারছেন না। তার অস্তিত্বই এখন সংকটে।

তিনি কাউকে কিছু বলতেও পারছেন না— তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। হৈমন্তি নাম ছাড়া আর কী নাম আছে সুরমার!

এই তো সুরমার কথা মনে পড়ে গেল।

আর যেন কী নাম।
আর যেন কি নাম সুকুমারী!
সুকুমারী চা-এর কাপ নিতে এসে থ।
তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে। বউদির শৈশবের ফোটোখানি অপলক দেখছেন।
বাবু আমাকে কিছু বললেন।
না বলছিলাম, আর কী যেন একটা নাম, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। সুরমা শুয়ে আছে কেন! আর যেন কী নাম?
কার নাম।
তোমার বউদির?
আপনি ভুলে গেলেন দাদাবাবু। এটা তো বউদির ছেলেবেলার ছবি। ড্রয়ারে পড়েছিল, তারপর বউদি ছবিটা বড় করে বাঁধিয়ে এনেছে।
বাঁধিয়ে তো আনবেই। চোদ্দো বছর। সে যে শরীর আবিষ্কারের সময় তখন। সেই স্মৃতি, কঠিন স্মৃতি, তাকে চিরস্থায়ী না করে রাখলে হয়— মেয়েটার কত চুল! শরীরে অবিনাশি প্রেম জেগে উঠছে। কুমারীর শরীর লন্ডভন্ড করে দিয়ে সে জননী হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।
সুকুমারী কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, দাদাবাবু বউদিকে ডাকছি।
আরে বউদিকে ডাকার কী আছে। বেচারা শুয়ে আছে। থাক না শুয়ে, কম ঝক্কি পোহাতে হয় না। আমি যাচ্ছি।
ঘরে ঢোকার আগে গলা খাকারি দিলেন তিনি।
ঢুকতেই সুরমা ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে চাদর সরিয়ে বসে দেখল বাবু তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন।
কী যেন মনে পড়ছে না।
ঠিক মনে হবে, আপনি চিন্তা করবেন না।
তোমার তো তিনটে নাম, দুটো মনে আছে— আর একটা কী যেন।
মনিকা।
ইয়েস মনিকা, চোদ্দো বছর। চোদ্দো বছর নিয়ে আমার একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আছে।
বাগানটা আমার দেখলেন না।
তুমি তো শুয়ে আছ।
চলুন।
আর তখনই কলোজিরে সম্বার দিলে সুকুমারী। বউদি তাকে বলেছিল, মানুষটা অফিসে এত রাশভারী, আর বাইরে বের হলেই ছেলেমানুষ। একেবারে তখন আলাদা তিনি। বাড়িতেও তাঁর নিঃসঙ্গতা আছে জানি। সবচেয়ে বিস্ময়, মানুষটা তাঁর বয়স লুকিয়ে রাখতে পেরেছেন। মনেই হয় না তাঁর রিটায়ারের বয়স হয়ে যাচ্ছে। দেখলে তো মনে হয় পঞ্চাশের বেশি না। তুমি রান্না করে ফেল। হয়তো তিনি ভুলেই গেছেন, কালোজিরে সম্বারে জিরেবাটা দিয়ে ইলিশের ঝোল নিজে হাতে করবেন বলে বায়না ধরেছিলেন।
তাঁর তো বায়নার শেষ নেই বউদি। সেই কবে এসে কতদিন ছিলেন না, তখনই একবার বায়না— শুটকি মাছ। মনে আছে তোমার বউদি।
মনে থাকবে না। কিন্তু মাসিমা যে তাকে বার বার বলে দিয়েছেন, অখাদ্য কু-খাদ্য খাবারে খুব লোভ মানুষটার, কবে ছেলেবেলায় মা জেঠিদের হাতের রান্নার তারিফ শুধু।
বাবুর এক কথা, আরে শুটকি মাছের ভর্তা দিয়েই এক থালা ভাত আমরা শেষ করে দিতাম। এতগুলি ভাইবোন, জেঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো— কতজন যে আমরা তখন একসঙ্গে বড় হয়ে উঠছিলাম! সে এক আশ্চর্য জীবন, বিস্ময়কর দেশ। আমার চোদ্দো বছরের দেশ। আমার মা জেঠিরা সেই দেশে ছিলেন। তাঁদের হাতে রান্না শুঁটকি মাছ অমৃত সমান।
বাবুর খুব আফশোস, ছেলে মেয়েদের নিয়ে একবার তার জন্মভূমি ঘুরে আসতে পারলেন না, পদ্মা মেঘনা নদী দেখাতে পারলেন না— বর্ষায় সারা প্রান্তর জুড়ে শালুক ফুল ফুটে আছে। নদীর পাড়ে গয়না নৌকা, রাতে নদীর বুকে ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া। জ্যোৎস্না থাকলে সে দেশটার রূপই পালটে যায়। লক্ষের আলো, খাল-বিল, নদী-নালার দেশটা বর্ষায় ভেসে থাকে। জ্যোৎস্নার জলের নীচের পুঁটি মাছটাও দেখা যায়, পুঁটি মাছের ঝাঁক জলের নীচে ঝাঁকে ঝাঁকে গোল হয়ে পাক খাচ্ছে— চিৎ হয়ে উপুড় হয়ে স্ফটিক জলে খেলা করছে, এ-সব দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখার সুযোগ নেই। একমাত্র আমার সেই দেশটায় আছে। এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে সেই দেশটায় যেতে হয়।
কত প্রশ্ন ছিল তখন সুরমার।
আপনারা দত্তবংশ।
ওহো। আমরা চ্যাটার্জি। সরকার, বিশ্বাস, দত্ত ভুইএগ্রা মানে ভৌমিক উপাধিগুলো বসবে। ভুইএগ্রার দেওয়া ঈশা খাঁ-র নাম শোননি! বারো ভুইএগ্রার এক ভুইএগ্রা। তারই দরবারের গুণিজনদের এই সব উপাধি দেওয়া হত। সোনার গাঁ জানো না কোথায়, ওটাই আমার দেশ, নবাবের কলাগাছিয়া দুর্গের সেনাপতি ছিলেন আমার পূর্বপুরুষ। কেউ আর নামের শেষে এদেশে এসে এই পদবিগুলি ব্যবহার করে না। সবাই নিজের বংশের কৌলিন্য রাখতে আবার নিজে জায়গা খুঁজে নিয়েছে। আমি কিন্তু ছাড়িনি।
আরও প্রশ্ন থাকলে বলতেন, চাঁদ রায় কেদার রায়ের নাম জান না। সোনাই বিবির নাম শোননি। চাঁদ রায়, কেদার রায় বংশের মেয়ে সোনাই— এই সব নিয়ে কত যাত্রাপালা হত। এখন আমরা চাঁদের কথাও ভুলে গেছি। তাঁর তখন আফশোস, সুরমা তুমি যে হৈমন্তি এ-কথা অস্বীকার করবে কী করে। মানুষের নাম তো পালটায়।
একজন মানুষই কত নামে ভূষিত হয়।
ছেলেবেলায় এক নাম।
এই যেমন আমার নাম, শৈশবের সেই জিতু ঠাকুর বলে চিহ্নিত। তার পকেটে থাকত একটা গুলতি। বাড়িতে ছিলেন আড়াই হাজার স্কুলের শিক্ষক, সুযোগ পেলেই গুলতি নিয়ে আর পকেটে পোড়া মাটির গুলি নিয়ে বের হয়ে পড়তাম— পাখি, কাঠবিড়ালি এবং একবার তো একটা সোনার ঈগল পাখি— বিশাল থাবা, কাক শালিখ বক— কিংবা ফড়িং কিছুই বাদ যেত না।
রাঘব দত্ত বললে, আমায় সেই শৈশবের মানুষেরা চিনতেই পারবে না।
আমি কখন ছোটবাবু, কখনও বিল্ব, কখনও সোনা— কত নাম বলো। হৈমন্তি বললে তোমার মুখ এত গম্ভীর হয় কেন। আমার কাছে তোমার পরিচয় হৈমন্তি। তাকে খাটো কোরো না।
তাকে খাটো করলে আমরাও খাটো হয়ে যাব।
হৈমন্তি না থাকলে আমার আর কী আছে বল!
তুমিই আমার সতীলক্ষ্মী, আমার স্ত্রী আছেন— তিনি আমার সমবয়সি। আমার চেয়ে তার সংসার বেশি বড়। পুত্র কন্যারা বেশি বড়। আমি না থাকলেও তার কিছু আসে যায় না। তোমার সঙ্গে তো তাঁর খুব ভাব। পাগলামির হাত থেকে তিনি রক্ষা হয়তো পেয়েছেন।
আপনি মাসিমার দোষ দেবেন না। তাঁরও বয়স হয়েছে, বুঝতে চেষ্টা করুন। সব বয়সে কামনা বাসনা সমান থাকে না। বয়সের ধর্মই এই রকমের। আমার উপর মাসিমার বিশ্বাস আছে। আর যাই করি আপনার শরীরের ক্ষতি হয়, এমন কিছু করব না। আপনাকে শুটকি মাছও খাওয়াতে পারব না। এত লঙ্কা আপনার সহ্য হবে না। তিনি আগেই বলে দিয়েছেন। মাসিমা আপনাকে নিয়ে কত চিন্তা করে আপনি জানেন না।
আমি যে তোমার কাছে এসেছি, তোমার মাসিমা কিন্তু জানে না।
তিনি জানেন। কী কী করতে হবে, কী কী করতে হবে না তাও বলে দিয়েছেন।
তবে দিবাকর বোধ হয় খবরটা বাড়ি পৌঁছেই তার মা-ঠানকে দিয়েছে।
কখন জানাল।
আপনি আসার পরই।
আমি যে এখানে আসব বলিনি তো।
আপনি মাসিমাকে বলেছেন।
বলিনি।
আপনার তো কিছু মনে থাকে না। বলছি খুব বড় ডাক্তার দেখান। হাতের কাছেই তারা আছে। কেন যে এই অবহেলা নিজের শরীর নিয়ে, সত্যি আমার কিছু ভাল লাগছে না।
তখনই সুকুমারী এসে বলল, আপনাদের খেতে দেওয়া হয়েছে।
তিনি বাগানের চাঁপা গাছটির খুব তারিফ করলেন।
স্বর্ণচাঁপার গাছ।
না। স্বর্ণচাঁপা নয়, দুর্গাচাঁপা।
দারুণ ঘ্রাণ তো। সারা বাড়িটা ম ম করছে।
তিনি বললেন, রজনীগন্ধার ঝাড়ও আছে মেলা। কিছু বেলফুল লাগিয়ে দিও। তার ঘ্রাণ বড়ই স্নিগ্ধ।
আছে। চলুন দেখাচ্ছি।
সে আলো জ্বেলে বলল, আপনি তো বলেছেন, তোমার ইচ্ছে মতো গাছ লাগাবে। কারও পরামর্শ নিতে যেও না। আমার ঘরের জানলার পাশে ছোট বাগানটি আছে, কত ফুল ফুটে আছে দেখবেন। বাড়িটা তো বানিয়েছি, শুধু

আপনাকে অনুভব করার জন্য।

খেতে বসেই তিনি হা হা করে উঠলেন, এত খেতে পারব না। এক টুকরো মাছ।

মুখে দিয়ে বললেন, মা জেঠিমার রান্না তোমরা পাবে কোথায়। মাছও তেমন পাওয়া যায় না। তোমাদেরও দোষ নয়। আসলে, আমাদের সেই পৃথিবীটাই হারিয়ে গেছে।

লিকার খাবেন। খাব পরে। ঘড়ি দেখে বললেন, মাত্র ৯টা বাজে। খুব হালকা কিছু খেলেন। কারণ, লিকার খেলে, সুরমাকেও সঙ্গ দিতে হয়।

শোনো সুরমা, আজ তুমি আমাকে তোমার চোদ্দো বছরের গল্প শোনাবে। কারণ, তুমি দেখছি, তোমার চোদ্দো বছরের কথা ভুলে যাওনি।

এ-কথা কেন বললেন!

কারণ চোদ্দো বছরেই তুমি কে তার খোঁজ পেয়েছিলে— না হলে এত ঘটা করে কেউ নিজের চোদ্দো বছরের ফোটো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। আমাকে তারপর আটবছর ধরে খুঁজছিলে, কি ঠিক কি না।

সুরমা কিছুটা মাথা নিচু করে বলল আপনার চোদ্দ বছরের গল্পটাও শুনতে চাই।

আমার শোনার মতো কিছু নেই।

আমারও নেই।

আছে। তোমার যোনিদেশ আসলে উপন্যাসটি পড়ে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। বই এর পিছনে আমার সেই কম বয়সের ছবিটাই তোমাকে হন্ট করেছিল। কি ঠিক কি না বল।

হবে হয়তো।

তুমি পাখি প্রজাপতি দেখেও আমার কথা ভাবতে। আমার ঠিকানার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। আমার কণ্ঠস্বর তোমার শোনার ইচ্ছে হয়েছিল। আমাকে ভেবে রাতে ঘুমোতে পারতে না।

আপনি কিছু জানেন না। আবোল তাবোল কথা বলছেন।

তবে শুনি সত্যটা কী।

আপনি আপনার চোদ্দো বছরের গল্পটা না বললে, আমি আপনার শর্তে রাজি না।

চোদ্দো বছরের গল্পটা কারও মনে থাকার কথা নয় বুঝি। চোদ্দো বছরে কী কী পরিবর্তন হয় তাও মনে থাকার কথা না, আসলে জানতে চাইছি, তুমি কীভাবে বড় হলে, আসলে, তোমার ধর্মকে প্রথম টের পেলে। আমার বলার মতো কিছু নেই। কারণ আমি তখন জিতু ঠাকুর। তুমি যে পাখপাখালির সঙ্গে কথা বলছ, আমি তখন গুলতি ছুঁড়ে সেই পাখ-পাখালি মেরে বেড়াচ্ছি।

তার গল্পই বলুন, তার কথা দিয়েই শুরু হোক।

তিনি বললেন, চোদ্দো বছরটা নারী বোঝে, অর্থাৎ বলতে গেলে চোদ্দো বছরটা নারীদের পূর্ণতা প্রাপ্তির কাছাকাছি সময়। আর পুরুষদের পক্ষে সেটা খুব জটিল নয়, স্বর ভঙ্গ হতে শুরু করে। আর তার সবই ঠিক থাকে। শিশ্ন ফুলে ওঠে, নারীর কথা ভাবলে কিন্তু মেয়েদের তা নয়।

পরিবর্তন শরীরে, মনে এবং চোদ্দো বছরে সে হাত দিয়ে আর সুখ পায় না। তিনি এমন বলে তার দিকে তাকালেন।

কারণ সে বোঝে তার যোনিদেশ লন্ডভন্ড করে না দিলে সে তৃপ্তি পাবে না। তিনি কথাটি বলে আবার তাকালেন সুরমার দিকে।

আপনাকে এ-সব কে বলেছে। সুরমা না বলে পারল না। আচ্ছা এই গোপনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে নারীদের কত সম্মানহানি হয় আপনি বোঝেন না।

আমি জানি।

তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব। রাখবে।

আপনার কথামতোই চলছি। আমারও অনেক বেশি খারাপ নেশা ছিল।

তুমি কি লিকার খাও এখনও।

না।

অর্থাৎ তুমি ভারতীয় সংস্কার দিয়ে যেতে চাইছ।

সংস্কার নয়। ভাল লাগে না। বাণীব্রতর দিকে তাকালে আমার ভয় হয়। আমার পুত্রও বীজ থেকে বৃক্ষ হয়ে যাবার মুখে।

এতদিন পর বাণীব্রতকে দেখে আমিও অবাক হয়ে গেছি। সে কি বলল, জানো তো, আমি যে বড় হয়ে গেছি মা বোঝে না।

সুকুমারীকে ডাকল সুরমা। বাবুর ঘরে টেবিল সাজিয়ে দাও। এঁটো থালা বের করে নাও। তুমি তোমার দিকের দরজায় তালা লাগিয়ে দিও, আমি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেব।

তা হলে জিতুর গল্প দিয়েই শুরু করছি সুরমা। সুরমা বসে আছে। ব্লেন্ডার্স প্রাইড খুলে সুরমা খুবই পরিমিত মদ লম্বা গ্লাসে ঢালল। সাদা চাদর কারুকাজ করা। দুটো সোফা দু-দিকে। তিনি বাগানে বসে ছিলেন। টেবিলে কিছু রজনীগন্ধার স্টিক। তিনি ফের বললেন, তা হলে জিতু ঠাকুরের গল্প নিয়েই শুরু করছি সুরমা।

জিতু শুয়ে থাকে চুপচাপ। কখনও হাঁটু ভাঁজ করে, কখনও চিৎ হয়ে। আজকাল অবশ্য সে বসতে পারে। ইচ্ছা করলে হেঁটে দরজা পর্যন্ত যেতে পারে।

তবে ভয় হয়। ভয় হলেই ভিতরে কাঁপুনি শুরু। চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে থাকে।

তাকে কতদিন এ-ভাবে শুয়ে থাকতে হবে সে জানে না। গোপাল ডাক্তার বলে গেছেন ঠানদি, এ-অসুখে ওষুধের চেয়ে বিশ্রামের দরকার বেশি। একদম হাঁটাচলা করতে দেবেন না। যত শুয়ে থাকবে, তত নিরাময় দ্রুত হবে।

ঠানদি মানে জিতুর ঠাকুমা, ঠাকুরদা, বাবা, ন্যাটা কাকা সবারই মুখে একদিন ত্রাস ছিল। সে বাঁচবে না। সে মরে যাবে। সারা শরীর ফুলে গেছে। রক্ত পেচ্ছাব। শুধু গ্লুকোজের জল ছাড়া মাসখানেক ধরে তার আর কোনও পথ্য ছিল না।

মাঝে মাঝে নিজের মুখ আয়নায় দেখলে সে আঁতকে ওঠে। কী হয়ে গেছে— যেন কঙ্কালের উপর চামড়া সেঁটে আছে— এ ছাড়া শরীরের শিরা উপশিরায় যেন রক্ত চলাচল থেমে গিয়ে কখনও তাকে এক গভীর অন্ধকারে ফেলে দেয়। তখন সে সত্যি কিছু দেখতে পায় না। মা! মা!

অবলা ছুটে আসে।

কী হয়েছে! কাঁপছিস কেন বাবা।

অবলা ছেলেকে জাপটে ধরে ফেলে— কী জানি যদি পড়ে যায়!

বিছানা থেকে নামলি কেন? তুই কী কারও কথা শুনবি না। কী হয়েছে তোর!

আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না মা।

অবলা ডাকে, ও ঠাকুরপো, শিগগির এস। কী বলছে জিতু।

অবলা কেমন থই পায় না। সবাই ছুটে আসে। দরজায় দাঁড়িয়ে বড় জ্যাঠামশাই। তিনি পূজার ঘরে আহ্নিক করতে বসেছিলেন। বউমার চিৎকারে ছুটে এসেছেন।

ঠাকুমাও ছুটে এসেছেন।

তিনি তাঁর বড় পুত্রকে বললেন, জিতুর এটা আজকাল হচ্ছে। সুরেন ডাক্তারকে ডাকতে হয়। গোপাল ডাক্তার তো বলে গেল দুর্বলতা থেকে। এ-নিয়ে ভাববেন না।

জিতু এখন বসতে পারে, এত দিন হয়ে গেল— জিতু এখন কাউকে ধরে ধরে হাঁটতেও পারে। ভাত পথ্য দিয়েছে কবে— শুধু ভাত চটকে মাঠা দিয়ে কে কতদিন খেতে পারে? নুন না, মশলা না, মাছ না সুরেশ ডাক্তারের এক কথা, নো প্রোটিন। ঠাকুমা গজগজ করছেন, কবে যে মাছ-ভাত পথ্য দেবে সুরেশ বুঝি না। তার কী, আসুক সুরেশ ওর চোদ্দোগুষ্টি উদ্ধার না করে ছাড়ছি না।

অবলা ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। মাথায় ঘোমটা। আর জিতু দেখল মা-র মুখ আবছা মতো। দুগ্গা ঠাকুর জলের নীচে ডুবে যাবার সময় যেমন ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যায়— তেমনি আবছা হয়ে যাচ্ছিল মা-এর মুখ।

আবার কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেলে, যেমন অস্পষ্ট হতে হতে হালকা কুয়াশা, কিংবা কুয়াশা সরে গেলে মুখ স্পষ্ট হয়ে যায়, শোবার সময় জিতু দেখল মা-এর মুখ তেমনি স্পষ্ট।

ঠাকুমার চোপা থামছে না।

গোপাল ডাক্তারের এখন মুণ্ডুপাত করছেন।— তুই মানুষ! আমার নাতিটাকে একটু মাছ দিলে কী হয়। নুন দিলে কী হয়। নুন ছাড়া ভাত খাওয়া যায়! নুন ছাড়া কেউ খেতে পারে। শরীরে জোর পাবে কী করে! অন্ধকার দেখবে না তো জোৎস্না দেখবে রে নির্ব্বংশো।

মণিমোহন জানেন, মা তার কিছুটা অবুঝ। এটা যে কত বড় অসুখ মা বুঝতে পারছেন না। তবু অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার বিষয়টা কেমন ঘোরতর আকস্মিকতা। শুধু উঠে বসলে, কিংবা হেঁটে গেলে যদি হত তবু না হয় কথা ছিল!

শুয়ে থাকলেও জিতুর মধ্যে বাড়তি উপসর্গটা দেখা গেছে।

চোখে অন্ধকার দেখলেই জিতু কেমন ত্রাসে পড়ে যায়। জলে ডোবা মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে।

সুরেনকে খবর দিল হয়। অসুখটা প্রথম সুরেনই টের পেয়েছিল। জ্বর না ভেদবমি না, এমন কি সামান্য সর্দি কাশিও না। জিতু কেবল স্কুল থেকে ফিরে ঝিমোত।

তার দস্যিপনার শেষ ছিল না। স্কুল থেকে ফিরে দৌড়ে রান্নাঘরে। একপাল ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে বাড়িতে। জিতু স্কুল থেকে সবার সঙ্গে ফিরে আসে ঠিক, কিন্তু তারমধ্যে যে দস্যুটা বাস করছিল— সে কেমন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। গুলতি নিয়ে পাখপাখালির পিছনে তাড়া করে না। ঘরে ঢুকে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে।

দাদারা হাত ধরে টানাটানি করে, ওঠ জিতু গোল্লাছুট খেলতে যাবি না।

ছোট ভাই বোনেরা হাত টানাটানি করে, রাঙাদা ওঠ না। স্কুল থেকে এসে অন্ধকারে ঢুকে বসে থাকলি। জিতু সবই বোঝে। সেই হেমন্তকাল, চারপাশ রোদ্দুর, কিন্তু রোদের তেজ কমে যাচ্ছে। চারপাশের আদিগন্ত মাঠে সরষে ফুল ফুটে আছে। কত গাছপালা পাখি, মাঠ এবং এই বিকেলের গোল্লাছুট খেলা— কিন্তু তার যে ইচ্ছে হয় না। সে যে জোর পায় না।

মণিমোহন সেদিন মাঠে যাবেন স্থির করেছিলেন। চকের জমিতে গমের চাষ হয়েছে বিঘার পর বিঘা। চড়ুই পাখির খুব উপদ্রব হয়েছে। জিতু যদি একটা কাক অথবা চড়ুই গুলতিতে নামিয়ে আনতে পারে। ওটা জমির মধ্যে একটা বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে পুঁতে দিলে কাকপক্ষীর উপদ্রব কমে। ফসলের ক্ষতি কম হয়। জিতুর অব্যর্থ টিপ ফসকায় না। সঙ্গে এ-জন্য জিতুকে দরকার ছিল।

তিনি তাকে ডেকে পাঠাতেই পূর্ণ এসে বলল, সে ঘরে শুয়ে আছে।

শুয়ে আছে?

তিনি সবদিক লক্ষ রাখতে পারেন না। এতবড় এজমালি সংসার— কার ঘরে কী ঘটছে খবর না পেলে জানবেন কী করে?

কেউ কিছু বলেছে, অথবা ওর মা শাসনও করতে পারে— কারণ জিতুর নামে এই বাড়িতে অজস্র নালিশ। ভাইপোটি এই বয়সে এত দামাল হয়ে উঠবে বিশ্বাস করতে পারেননি। এতে তাঁরও যে আসকারা ছিল না বললে ভুল হবে।

তিনি চঞ্চল স্বভাবের ছেলেদের বেশি পছন্দ করেন। জিতু বাড়ির অন্য ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে একটু বেশি মাত্রায় উৎপাত করতে পছন্দ করে। যাকে বলে— প্রাণের উন্মেষ— কারণ প্রকৃতির মধ্যে গাছপালা পাখির মতো বড় হয়ে ওঠার যে সহজ নীরব ব্যবস্থা থাকে— জিতুর ভিতর তার উপস্থিতি তিনি টের পান। খুশি হন।

জিতু এ-জন্য তাঁর কাছে একটু বেশি প্রিয়। বেশি প্রশ্রয় পায়।

ছেলেটার ভয় ডর কম। ক্লাস ফোরে পড়ে। পুকুরের গর্ত থেকে সিঙ্গি মাগুর খুঁজে টেনে বের করতে গিয়ে একবার একটা আস্ত খরিস টেনে বের করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল— পুকুর ঘাটের সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল— একটা আস্ত খরিস জিতুর হাত জড়িয়ে আছে। সে এক ঝটকায় সাপটাকে পুকুরের পাড়ে ফেলে দিতেই ফণা তুলে পালাচ্ছিল।

জিতু পারে— সব অনায়াসে পারে।

জ্যাঠামশাই বললে, সে কাক শালিখ টিয়া গাছ থেকে টপাটপ নামিয়ে আনতে পারে।

তার নেশা একটাই। স্কুল থেকে ফিরে হাতে গুলতি নিয়ে বের হয়ে যায়।

দু-পকেটে থাকে পোড়মাটির গুলি। কাঠের আঁচে কম পুড়লে লাল, বেশি পুড়লে কালো। পাথরের গুলি হার মানে।

সেই জিতু ঘরে বসে থাকলে আশঙ্কার কথা। বনজঙ্গলের জিতু ঘরে শুয়ে আছে ভাবা যায় না।

জিতু কিন্তু একটু পরেই বার-বাড়ির উঠোনে এসে জ্যাঠামশাই-এর সামনে দাঁড়িয়েছিল। জ্যাঠামশাই খুঁজছেন তাকে। সে শেষপর্যন্ত শুয়ে থাকতে পারেনি।

আমাকে ডেকেছেন!

চোখ মুখ ফোলা ফোলা— মুখ ভার।

কাছে আয়।

মণিমোহন বলেছিলেন, শুয়ে আছিস কেন?

সে জোর পায় না, তার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কেবল ঘুম পায় বললেই হয়ে গেল।

সে মণিমোহনের সংলগ্ন হয়ে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছিল।

তার কোনও অসুখ যদি টের পান, তবে খাওয়াদাওয়া বন্ধ। স্কুল বন্ধ। বিকেলে বের হওয়া বন্ধ। অসুখ তো তার কখনও হয় না। জ্বর জ্বালাও না। অসুখ বড় ভয়ের।

একবার কবে যেন, সেই বছর দুই আগে ঠিক পুজোর মুখে তার জ্বর হয়েছিল। সে তিন চার দিন জ্বর নিয়েই স্নান করেছে। কাউকে বুঝতে দেয়নি।

কিন্তু শেষে ধরা পড়ে গেল।

রাতে এমন কম্প দিয়ে জ্বর এল যে না বলে পারেনি, মা আমার শীত করছে। কাঁথা দাও।

জিতুর এই অস্বাভাবিক কথাবার্তায় অবলা গায়ে হাত দিয়ে আঁতকে উঠেছিল। গা পুড়ে যাচ্ছে।

কাছে গেলে মণিমোহন ওর কপালে, ঘাড়ে হাত দিয়েছিলেন। তার জ্বর। যাও, শুয়ে পড়গে। জ্বর বেশিক্ষণ না হলে ভাত পাবে না। দু'বেলা বার্লি।

সে জানে জেঠু টের পেলেই সর্বনাশ।

সে একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল।

তবু জেঠু গায়ে হাত দিলেন না। গা একেবারে বড়দের মতো ঠান্ডা। সর্দি কাশিও নেই। অথচ মুখ এত টসটসে! যেন জিতুর সুখে রক্তচাপ বেড়ে গেছে।

তোর কী হয়েছে! অবেলায় শুয়ে আছিস! স্কুলে গেছিলি! শরীর খারাপ!

না।

জিভ দেখি।

জিতু জিভ বের করে দেখিয়েছিল।

মণিমোহন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

বলেছিলেন খাওয়ার অরুচি আছে?

জিতু বলেছিল, না।

তবে কী হতে পারে! মণিমোহন দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলেন।

গ্রাম জায়গা। হোমিওপ্যাথ গোপাল ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এই অঞ্চলের সেই একমাত্র ডাক্তার। নাম যশ আছে।

গোপাল ডাক্তার বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে দেখেছিল। নাড়ি টিপে দেখেছিল— কিছুই বুঝতে না পেরে বলেছিল, মনে হয় চোরা সর্দি কাকা। দশ পুরিয়া ওষুধ রেখে খাবার সময় সকাল বিকাল নিয়ম করে খেতে বলে গেল।

চার পাঁচদিনও পার হয়নি, জিতু চলাফেরা করছে ওষুধ খাচ্ছে, কিন্তু জিতু বুঝতে পারছিল, তার মুখ আরও ফুলে গেছে। পা ফুলে গেছে।

মণিমোহন লোক পাঠালেন দশক্রোশ দূরে পাঁচদোলায়। এল এম এফ ডাক্তার। নিদানকালে তিনিই ভরসা। সুরেন ডাক্তার এ-অঞ্চলের ধন্বন্তরী— সুরেন ডাক্তার সাইকেলে চেপে এলেন। ঘরে ঢুকে টর্চ মেরে জিতুকে দেখলেন— ইস্ কী করেছেন! কিডনি গ্যাছে। তারপরই লড়াইটা শুরু। যমে মানুষে টানাটানি। গোপাল ডাক্তারও খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। ইউরিন, ব্লাড নিয়ে শহরে।

হ্যাঁ, সুরেন ডাক্তার যা বলে গেছেন, ওষুধ নেই। ইউরিন ব্লাডের রিপোর্টেও ধরা পড়েছে, শরীরের লোহিত কণিকার খুবই অভাব। পেচ্ছাপের সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছে— নিরাময়ের প্রশ্নে, শুধু গ্লুকোজ। আর রেস্ট। নড়াচড়া একদম বারণ। অসুখটা নেফ্রাইটিস, কিডনি ড্যামেজ।

এতটুকু ছেলের এই অসুখ! মাথায় হাত। কী কারণে হতে পারে। বাড়ির মানুষজনের নানা জিজ্ঞাসা। গোপাল ডাক্তার সবটা ব্যাখ্যা করে বলতে, মণিমোহনের মাথা খারাপ। টনসিল ইনফেকশান থেকে হতে পারে, নোংরা থেকে হতে পারে, কোমরে চোট পেলে হতে পারে। কথাবার্তা সব বাইরে। ইউরিনের সঙ্গে রক্ত যাচ্ছে। আর বি সি কুড়ি। নেফ্রাইটিস। এ আবার কী অসুখ! দিন দিন কত রকমের অসুখ যে দেখা দিচ্ছে। ইনফেকশানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য দু-বেলা দুটো পেনিসিলিন ইনজেকশান। যুদ্ধের পরবর্তী সময়। সাথে অ্যান্টিবায়োটি নামে ওষুধটি আবিষ্কার না হলে, শুধু গ্লুকোজের জল। সারাদিন পাশ ফিরে শুয়ে থাকা।

পাশ ফিরতে হলেও মা কিংবা কাকিমা জেঠিমারা এলে পাশ ফিরিয়ে দেন।

জিতু একজন চঞ্চল বালক, তার এমন শাস্তি কেন হয়। কোন পাপে হয়। বন্ধুরা সব দরজায় উঁকি মেরে যায়। ঘরে ঢোকা নিষেধ— আর জিতু চোখ বুজে পড়ে থাকে। ঠাকুমা শিয়রে বসে থাকেন। না হয় মা। কোনও কষ্ট নেই অথচ কী কঠিন অসুখ!

অসুখ থাকলে কষ্ট থাকবে না, হয় না।

জিতু কেবল শুয়ে থাকে।

মাসখানেক পর জিতুকে বসতে হলে মা সাহায্য করেন। সে দুর্বল এবং ক্ষীণকায় হয়ে যাচ্ছে।

আর মাসখানেক পরে জিতু হাঁটতে গেলে মা ধরে ধরে হাঁটান। তার ক্ষমতাই নেই একা হাঁটার। শরীরের মুখের ফোলা একেবারেই নেই।

ইউরিনে আর, আর বি সি পাওয়া যাচ্ছে না। ল্যাস-সেল আছে কিছু, তবে সে ভাল হয়ে উঠছে। শরীর মুখ ফের স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তবু তাকে ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয় না। হাড়ের উপর চামড়াখানি তার সার। মানুষের কঙ্কালই বলা চলে তাকে। শরীরে এতটুকু ধকল পড়লেই আবার রিলাপস করতে পারে।

খাবারে প্রোটিন নিষিদ্ধ। আলুসেদ্ধ ভাত শুধু। আলোনি আলুসেদ্ধ ভাতেই এখন

অমৃত তার কাছে।

সুরেন ডাক্তার যে বার বার সতর্ক করে দিয়ে গেছেন— অসুখটা খারাপ। অনিয়ম হলে ফের রিল্যাপস করতে পারে। বছরখানেক ইস্কুল-টিস্কুল যাওয়া বন্ধ। যা খেতে দেওয়া হচ্ছে তার বাইরে নয়। জিয়ল মাছ নতুন পথ্যে যোগ হয়েছে। তেল না, মশলা না, নুন না— ট্যালট্যালে ঝোল আর মাছ কাহাতক ভাল লাগে?

বড়জোর কোনও পাপ না থাকলে জিতুর এই অসুখটা হওয়ার যেন কথা নয়। কথায় কথায় পাখি কাঠবিড়ালি এমন কি জিতুর আরও সব নিষ্ঠুরতার ছবি মণিমোহনের চোখে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হতে থাকল— এই পাপেই এই অসুখ। তিনি গৃহদেবতার ঘরে প্রায় সারাক্ষণই পড়ে থাকতেন— তার প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে, জিতুকে ভাল করে দাও ঠাকুর। ছেলেমানুষ, চঞ্চল, সে কি পাপ-অপাপ বোঝে? এবং তিনি গুলতিটার খোঁজেই আছেন। সেই গুলতিটা, ওটা পুকুরে ফেলে দেওয়া দরকার। কিন্তু ওটা কোথায় আছে জিতুই বলতে পারে। অসুস্থ জিতুকে কিছু বলাও যায় না। বিষয়টা দু-কান হলে জিতুর কানেও উঠতে পারে। সে খুবই বিমর্ষ হয়ে যাবে। তার মা চিলিনাপুরের কালীবাড়ি গিয়ে পাপ মোচনের জন্য শেষে হত্যেও দিতে পারে।

আর এ-ভাবেই ঘরটা যেন জিতুকে বন্দি করে ফেলল। জানালার বাইরে বার-বাড়ির উঠোন। উঠোন পার হলে ফুলবাগান। কত রকমের ফুল ফুটে আছে বাগানে। তারপর গাঁয়ের রাস্তা— কোথাও সে যেতে পারে না। সে শুয়ে থাকে। জানালা দিয়ে সব দেখা যায়। সে রাস্তার লোকজন দেখে।

পরিচিত অপরিচিত, সবাই একবার তার জানলার দিকে তাকায়।

তার জানালায় কেউ কেউ এসে দাঁড়ায়ও।

ফ্রকপরা নিয়তি, শোভা, আবু, পারুলদি এমনকী শহর থেকে অঞ্জলি এসেছিল তার আত্মীয় বাড়ি, সেও জিতুকে এসে দেখে গেছে।

রাস্তায় কী মনে করে যে থমকে দাঁড়ায়— বুড়োবুড়িরাও আছে, তারাও লাঠি ঠুকে জানালায় আসে।

কী চেহারা হয়ে গেছে! শরীর বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে, হা ভগবান তোর মায়া দয়া নেই ইস কি নিষ্ঠুর ভগবান। কোন পাপে তার এই রোগ।

জিতু যেন বলতে চায়— আমার কী পাপের শেষ আছে দিদিমা।

মণিমোহন একদিন কাকে যেন ধমকও দিয়েছিলেন— এই কিসের পাপ শুনি। খবরদার খবরদার আজেবাজে কথা জানালায় এসে বলবে না। মানুষের অসুখ -বিসুখ হয় না। অসুখ হলেই পাপ! যাও এখান থেকে।

জিতু এভাবে দেখতে পায় সকাল হচ্ছে। কাক শালিখ উঠোনে। পুকুর পার হয়ে মাঠ। সেখানে এখন পেঁয়াজ রসুনের চাষ। তামাক পাতার চাষ। শীতকাল পার হয়ে গেল।

সে যেদিন এই ঘরে প্রথম বন্দি হয়, তখন মাঠে মাঠে তিলফুল ফুটেছিল। এখন তিলফুলের চাষ। এখন বৈঠকখানার পাশের চিনিপাতা আম গাছটায় বোল এসেছে। বোলের ঘ্রাণে মৌমাছিরা উড়ে এসেছে।

আর সে একদিন কেন যে দেখল মৌমাছিরা সব উড়ে আসছে তার দিকে। তারা তাকে ঘিরে ফেলেছে— কিংবা কখনও শয়ে শয়ে কাঠবিড়ালি। পাখিরাও বাদ নেই।

সবাই যেন প্রতিশোধ নিতে চায়।

কেমন লাগছে! আর আমাদের মারবে?

তুমি খুনি, তুমি পাপী। পাপ বাপকেও ছেড়ে দেয় না বোঝ!

এমন সব বিশ্রী দৃশ্য দেখলেই সে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। বুক কাঁপে। যদি সত্যি ওরা উড়ে আসে। বদলা নেয়! সে তখন চোখ বুজে পড়ে থাকে। কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না।

ইদানীং মণিমোহন জিতুর এই উপসর্গটা নিয়ে ফের দুর্ভাবনায় পড়েছেন।

মণিমোহনরা সেবাইত বংশ। বাড়ির পাশে বিশাল বাঁশের জঙ্গল। তারপর মাঠ এবং নদী। নদীর ধারে কালীর থান। জাগ্রত দেবী। চিলিনপুরের কালীবাড়িতে দেবী মূর্তি আছে, এখানে শুধু থান আছে। কোনও দেবীমূর্তি নেই।

অনেকটা এলাকা জুড়ে এই মন্দির, যাত্রীনিবাস, আমবাগান, লিচুবাগান— কোথাও তৃণভূমি। পৌষমাসে মেলা বসে শনি মঙ্গলবার। দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন পিকনিক করতে আসে।

পরিবারের একটা বড় আয় মন্দির থেকে হয়। পূজারি বামুন আছেন— বলির জন্য গোবিন্দ ঠাকুর। শনি মঙ্গলবারে দু-পাঁচটা পাঁঠাও পড়ে। বলির পাঁঠা। পাঁঠার মুন্ডু গেঁথে নিয়ে আসে গোবিন্দ ঠাকুর। কখনও বড় নতুন গামছায়।

জিতু বলির বাজনা শুনলেই স্থির থাকতে পারত না। কালীর থানে তার ছুটে যাওয়ার বাতিক।

খুব ছোট বয়সেই জিতু তিনুকাকার হাত ধরে চলে যেত মন্দিরে। তিনুকাকা মন্দিরের চাতালে, সটান শুয়ে পড়ত, মা মা বলে চেঁচাত, তাকেও গড়াগড়ি দিতে হত। পাপমোচন হয় বলত। মন্দিরের ভিতরে পাথরের থান, আর একটা অতিকায় শিবলিঙ্গ— ধূপ দীপ জ্বলত।

ঠাকুর মশাই একটা বাঘের ছালের উপর বসে, ওম শিবায় নম, ওম ত্রিকূটেশ্বরীভে নম আরও সব মন্ত্রপাঠ, আর আতপ চালের ছড়াছড়ি— ডাইনে বায়ে সব ছিটিয়ে দিতেন।

মন্দিরের সব কোণায় তিনুকাকার হাত ধরে বসে থাকত জিতু।

ঠাকুর দেবতা বলে কথা।

সে দেখত বাইরে তখন ঢাক বাজছে। কাঁসর বাজছে। পাঁঠা বলি হচ্ছে।

সে দেখত মুন্ডু গড়াচ্ছে একদিকে, ধর গড়াচ্ছে একদিকে— আর গলগল করে কাটা পাঁঠার রক্তে শান ভেসে যেত। মহামায়ার এমনই বীভৎস রূপ—তিনুকাকা তাকে সান্ত্বনা দিতেন।

পাঁঠাগুলি শীতের সময় জলে চুবিয়ে আনলে কেমন ফুলে থাকে। তার যেমন শরীর ফুলে গেছিল। এখন তো তার কঙ্কালসার চেহারা— এই সব দৃশ্য চোখে ভেসে উঠলেও জিতু চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। অসুখের সময় মনে হয়েছে, সেও যেন এক বলির পাঁঠা। সে মরে যাবে এই আতঙ্কে মাঝে মাঝে তখন ফুঁপিয়ে কাঁদত।

পাঁঠারা কি জানে, চান করিয়ে তাদের দেবীর কাছে উৎসর্গের জন্য আনা হয়েছে!

এবং সে মাঝে মাঝে পাপ বোধে এ-ভাবে আচ্ছন্ন থাকত।

এবং এত বলি দেখতে দেখতে ভিতরে সে যে নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে, প্রকৃতির এই বিনাশ চলছেই— পাখি কাঠবিড়ালি থেকে ফড়িং পর্যন্ত তার নিষ্ঠুরতার শিকার হত।

তার কোনও মায়া দয়া ছিল না। প্রজাপতি, ফড়িং দেখলেই সে দৌড়াত তাদের পিছু পিছু। ধরতে পারলেই তাদের পাখা ছিঁড়ে জঙ্গলে ছুড়ে দিত— এই নিষ্ঠুর আচরণ তাকে ক্রমে উন্মাদ করে তুললে, সে পাখি কিংবা কাঠবিড়ালি দেখলেও ঢিল ছুড়ত, কোনও কাজ হত না। পাখি কাঠবিড়ালি তাকে ফাঁকি দিয়ে পালাত।

এই প্রকৃতি নিধন তার যেন নেশা হয়ে গেছিল। তবে ফড়িং ধরে লেজে সুতো বেঁধে দিলেও, কাঠবেড়ালি কিংবা পাখপাখালিকে শায়েস্তা করতে পারত না। তারা জমির শস্য নষ্ট করে দেয়। তারা যেমন চড়াই এর ঝাঁক তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়— এবং এক সকালে সে পেয়ারা গাছের একটা বেঁকা ডাল কেটে এনে সাইকেলের পরিত্যক্ত টিউব কেটে জুড়ে দিলে দেখল ওটা একটা গুলতি হয়ে গেছে।

পকেটে গুলি, হাতে গুলতি, তাকে আর পায় কে! অসুখের সময় বার বার কেন যে মনে হত—পাপে তাপে সব বিনাশ হয়। সেও বিনাশের মুখে। মৃত্যুর এক বিষণ্ণ চেহারা চোখে ভেসে উঠলেই সে চেঁচাত— সবাই ছুটে আসত, কারা যেন তাকে খুন করতে আসছে।

দেবীর থানে পাঁঠা পড়ছে, ধড় একদিকে। মুন্ডু একদিকে।

সে দেখতে পায় তার ধর একদিকে মুন্ডু একদিকে পাঁঠারা তো জানে না, তারা বলিপ্রদত্ত— সেও যদি না জানে! এই দৃশ্যটাও তাকে পাগলা করে দেয়। শরীর অবশ হয়ে আসে— হাতে পায়ে বল থাকে না। চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে।

মানুষ আগাম সব খবর জানতে পারে।

সে কী সত্যি ভাল হয়ে উঠছে, না ফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

মণিমোহন শিয়রে বসে ডাকলেন, জিতু ওরা আসছে, কারা!

জিতু কিছু বলছে না ভয়ে।

ওরা কারা জিতু।

জিতু চোখ খুলে তাকাল। দেখল তার জেঠু শিয়রে বসে আছে।

তুমি দেখতে পাচ্ছ জিতু! কারা আসছে।

সে চুপ করে থাকত।

জিতু পাশ ফিরে শুলো। দেবী যে তার সামনে মাঝে মাঝে খড়্গধারিণী হয়ে যায়— শিয়রে যে তিনি রক্ত লোলুপ হয়ে জেগে থাকেন— সে জেঠুকে বলে কী করে!

আসলে জিতুর এখন কথা বলতেই ভাল লাগছে না। তার জানলায় একটা পাখি পর্যন্ত উড়ে আসে না।

ইদানীং তাকে সকালে খই খেতে দেওয়া হয়। সে চায় পাখি, কাঠবিড়ালি, ফড়িং ও প্রজাপতিরা উড়ে আসুক তার জানালায়।

সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

বন্ধুত্ব করতে চায়।

সে তার খই নিজে না খেয়ে জানলা দিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে রাখে। শেফালি গাছটার নীচে একসময় কত পাখি দেখেছে। আম-জাম গাছে-পুকুর পাড়ের কামরাঙা গাছটার কিংবা বাড়ির সর্বত্র, রান্নাঘরের চালে, বড় উঠোনে শালিখ কাক চড়াই কত উড়ে আসত। ধান রোদে শুকোতে দিলে, তাদের উপদ্রব। ঠাকুমা একটা হালকা লম্বা বাঁশ হাতে নিয়ে বসে থাকত। পাখি, কাঠবিড়ালি তাড়াত— কোথায় যে গেল সব!

এখন কেন যে তারা সব নিখোঁজ হয়ে গেল! তার ছড়িয়ে দেওয়া খই খেতে কেউ আসে না।

আর তখনই পাড়ার অঞ্জু এসে দাঁড়াল তার জানালায়। কাঁখে কলসি। তাদের ইদারা থেকে জল নিতে এসেছে।

সাদা ফ্রক গায়। অঞ্জু এই বয়সেই কেমন বড় হয়ে গেছে। পাকা পাকা কথা বলে। সে এমন সব গোপন কথা জানে, যা শুনলে তার শরীর শিরশির করে। এবং এ-সব ভাবা যে পাপ, মনে হলেই গুটিয়ে যায়।

অঞ্জু শোভা আবু আর সব ছেলে মেয়েরা তার হাতে গুলতি দেখলেই ধাওয়া করত। এরাই ছিল তার সঙ্গী।

বলতে গেলে, যখন সে গুলতি নিয়ে পকেটে গুলি নিয়ে বের হত, ওদের কাজ ছিল আবিষ্কার করা— ওই দ্যাখ জিতু কলাই ক্ষেতে একটা বক উড়ে এসে বসেছে।

ওরাই তাকে উত্তেজিত করে তুলত।

ওরাই তাকে বাহবা দিত।

তখন জিতু ওদের বলত, চুপ। কথা বলিস না। একদম নড়বি না।

কলাই ক্ষেতের মধ্যে একটা সাদা বক। সতর্ক পায়ে হাঁটছে।

জিতুকেও সতর্ক থাকতে হয়।

চারপাশে সবুজ কলাইগাছ। দূরে হাইজাদির পোস্টাফিসের বাড়ি। সেখানে আছে একটা নীল বাক্স।

জিতু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখতে পেলেই বকটা উড়ে যাবে। জিতু হামাগুড়ি দেয় আর ভাবে সে চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়। ভিটা জমির ন্যাড়া শেওড়া গাছটার মাথায় একটা শঙ্খচিল।

সে হামাগুড়ি দেবার সময় দেখতে পায়, গরু নিয়ে শীতল মাঝির বেটা বের হয়ে পড়েছে। আলে আলে ঘাস খাওয়াবে।

শঙ্খচিল উড়ে গেল।

ঘাসের মধ্যে ডুবে আছে জিতু।

পুকুরপাড়ে বড়দা ডাকছে, এই জিতু পড়া ফেলে উঠে এসেছিস! মাস্টারমশাই খুঁজছে। জিতু কোথায় গেল। বড়বাড়ির নাম করে বের হয়ে গেল। এতক্ষণ লাগে!

জিতু মাথা তুলছে না।

জিতু সাড়াও দিচ্ছে না।

সাড়া দিলেই বড়দা তাকে ধরে নিয়ে যাবে। কিংবা বাড়ির মাস্টারমশাই নিজেও চলে আসতে পারেন।

তাকে নিয়ে যেন সবার জ্বালা— সে হামাগুড়ি দিচ্ছে, ঘাসের মধ্যে ডুবে আছে। কেউ নেই। বড়দাকে দেখে অঞ্জু আবু শোভা হাওয়া। এরাই যে তাকে লেলিয়ে দিচ্ছে, বড়দা বোঝে।

এই অঞ্জু পালাচ্ছিস কেন! জিতুকে দেখেছিস।

আমি জানি না দাদা।

মিছেকথা। তুই জানিস। ওকে ডাক।

হামাগুড়ি দিতে দিতে জিতু ভাবল, ইস, তার দাদাটা যে কী। এই সামনে এত কাছে শিকার, আর দাদা ডাকছে, তার ভারী রাগ— যা হয় হবে— শাঁ করে সে একটা গুলি ছুড়ে দিল। লাগল না। বকটা নিজের মতো ঠ্যাং বাড়িয়ে ঘাসের পোকামাকড় খাচ্ছে।

বড়দা বলল অঞ্জুকে, ওকে বলবি ফিরে গেলে তাকে নীল ডাউন করিয়ে রাখা হবে। বুঝলি কিছু।

অঞ্জু মাথা নাড়তেই বড়দা চলে যাচ্ছে— কোথায় খুঁজব। তবু আজ রবিবার বলে স্কুলের তাড়া নেই। তোর কী হয় দেখবি।

ঘাসের মধ্যে ডুবে আছে জিতু, সে মাথা তুলছে না। মাথা তুললেই সে ধরা পড়ে যাবে। বকটাও উড়ে যেতে পারে। নীল ডাউন, সে দেখা যাবে।

সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে জিতু।

শঙ্খচিলও উড়ে গেল।

কেবল জঙ্গলের মধ্যে বকটা শিকার করার অভিযান দেখার জন্যই শোভা আবু ঘাপটি মেরে আছে।

আর এতবড় মজার মধ্যে প্রকৃতির কূট খেলাও থাকে।

জিতুর লম্বা শরীর আর সে বড় হওয়ার মুখে। সান্নিধ্য যে উষ্ণতার জন্ম দেয়। কারণ শোভা আবু দেখতে পাচ্ছে জিতুর পায়ের গোছ— হাফপ্যান্টের অন্তরালে সবই দেখা যায়, অথবা যদি উরু থেকে জংঘার সংলগ্ন স্থান দেখা যায়, সেই আশাতেও তারা যদি দাঁড়িয়ে থাকে, কারণ বড় হবার খেলা বড়ই নির্মম কারণ প্যান্টের নিম্ন অঞ্চলে থাকে কোনও গভীর অঙ্কুর উদ্গমের কথা— জিতুর সঙ্গে পালিয়ে জলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর নেশার কারণ যেমন এটা হতে পারে, আবার জিতুর বীরত্ব, হাতের টিপ এবং চোখের সামনে কোনও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী থাকায় একটা গৌরবও তারা টের পেতে পারে।

জিতু টিপের নাগাল পেতেই গুলতি টেনে ধরল। তারপর ছুঁড়ে দিল পাথরের মতো শক্ত মাটির পোড়া গুলি।

কলাই ক্ষেতে বকের মাথা উঁচু হয়ে আছে— সাপের মতো ফণা তুলে দিলে যেমন দেখায় আর কি। জিতু যখন গুলিটা ছুঁড়ে দেয়, তার কাছে ওটা সাপের ফণা ছাড়া কিছু নয়। পাখিটা উড়ে যাবার চেষ্টা করল, পারল না।

ঘাড় হেলিয়ে পড়ে থাকল কলাই-এর জমিতে। শোভা আবু দৌড়ে আসছে। একটা বক খতম।

আসলে বকটা কোথা থেকে উড়ে এসেছিল কীটপতঙ্গ খেতে। ঘাসের মধ্যে কীটপতঙ্গ ফড়িং উড়ে বেড়াতেই পারে। আর প্রকৃতি এই সুষমার মধ্যে জীবন বড় করে তোলে এ-ভাবেই।

আসলে বেঁচে থাকার প্রণালী, খাদ্য খাদক সম্পর্ক— কিন্তু জিতু যখন গুলিটা ছুঁড়েছিল, মাত্র একটা বকের মাথা টিপ করে— আসলে জমিতে ছিল তখন অজস্র বক। এতসব কলাই গাছ যে তার ভিতর কোথা থেকে উড়ে এসেছিল জিতু জানে না। জিতু একটা বকই দেখেছে এবং বকটা মারা পড়তেই জিতু দেখল ঝাঁক ঝাঁক বকের সারি কোথা থেকে উড়ে এসে মৃত পাখিটার উপর গোল হয়ে উড়ছে।

তারপর মনে হল, অজস্র সাদা বকের ঝাঁক তাকে ঘিরে ফেলছে। কিছুটা ঢেউ এর মতো উঠছে নামছে। এবং ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশ, যেন কলাই ক্ষেতটা বকের ছায়ায় ঢেকে গেছে। শোক জ্ঞাপনের নিমিত্ত না তাকে ঠুকরে খাবার জন্য পাখিগুলির এই ফন্দি। আর পাখির অজস্র কলরবের মধ্যে পাখিদের কোনও শোকজ্ঞাপনের কথাও থাকতে পারে।

কিন্তু পাখিরা আকাশ অন্ধকার করে নীচে নেমে আসছে। তার মাথার চারপাশে চক্রাকারে উড়ছে— কেমন এক ব্যূহ সৃষ্টি করার প্রয়াস যেন? পাখির ধারাল ঠোঁট কীভাবে মাছ কীট পতঙ্গ গেঁথে ফেলে সে তা জানে।

যদি নীচে নেমে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে— চারপাশের অন্ধকার আরও ঘন হয়, সে যদি কিছু দেখতে না পায়, তবে ঠুকরে ঠুকরে তাকে আস্ত সাবাড় করে দেবে। কীট পতঙ্গ ভেবে, তাকে পাখিরা শেষ করেও দিতে পারে।

সে ছুটতে চাইল।

সামনে একটা বিশাল পাখি শকুনের মতো পাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পাখি তেড়েও আসছে।

সে যেন পালাবার কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।

সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তাকে পাখিরা ঘিরে ফেলেছে। এমন কী উড়ে উড়ে পাখিরা যে মলমূত্র ত্যাগ করছে, তাতেও সে ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

সে আবু শোভাকেও খুঁজল।

নেই।

কিছুই নেই।

আছে শুধু কলাই ক্ষেত। আর পায়ের কাছে মৃত পাখিটা। ঘাড় গুঁজে ঘাসের মধ্যে ডুবে আছে।

পুকুরের পাড় দেখা যাচ্ছে না। পাড়ে কিংবা সোপাটে মেলা মাদার গাছ, না কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এমন কী সে ছুটতে পারছে না, পালাতে পারছে না— সামনে পাখিদের ঘোর চক্র ছাড়া সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

সে হতাশ।

সে শেষ।

আর তখনই মনে হল ওর কান ধরে কেউ টানছে। বড়দার গলা। এই তোর বড় বাড়ি, আবার একটা পাখি গুলি করে মেরে ফেললি। এতে কত পাপ হয় জানিস!

তোর মায়-দয়া নেই!

চল, আজ তোকে স্যার কী করে দেখবি!

হাতে বেত নিয়ে বসে আছেন।

কান টেনে নিয়ে যাচ্ছে, জিতুর হঠাৎ কথাটা মনে হতেই সে বুঝল, কানে লাগছে।

ছেড়ে দে দাদা, খুব লাগছে। আর তখনই কেন যে দেখল, সামনে সব ফাঁকা জমি— কোথাও কোনও পাখি উড়ছে না, এই ঘোর থেকে আত্মরক্ষাই হত না,

বড়দা না এলে।
বড়দা মানস বলল, স্যর তোকে কান ধরে টেনে নিয়ে যেতে বলেছেন। তুই এত নিষ্ঠুর।
ছেড়ে দে দাদা, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি— কিন্তু কী যে হল, সে হাতে পায়ে জোর পাচ্ছে না— শরীর কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছে।
সে বসে পড়ল।
সে কোনও ভোজবাজির মধ্যে পড়ে যায়নি তো!
বড়দা সত্যি কী তার কান ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, না সেও কোনও ঘোর থেকে হচ্ছে—
তবু জিতু বলল, দাদা আমার কান ছেড়ে দে। আমি হাঁটতে পারছি না। চোখে দেখতে পাচ্ছি না।
প্রায় ধরাধরি করেই মানস, শোভা, আবু সবাই মিলে তাকে তুলে নিয়ে গেল— তারপরই জিতুর অসুখ। মুশকিল সে খুব বেশি মিছে কথা বলে।
মণিমোহন জানেন। অসুখ বিসুখ হলে সহজে বলতে চায় না— পালিয়ে বেড়ায়। তাকে ধরা যায় না।

মণিমোহন বললেন, জিতু চোখে দেখতে পাচ্ছিস?
জিতু পাশ ফিরল না। জবাব দিল না। জানালার দিকে তাকিয়ে আছে।
সে তো সবই দেখতে পাচ্ছে এখন।
সবাই মিলে কি কোনও ষড়যন্ত্র করছে! করতেই পারে। সে যাতে আর একা কোথাও বের না হয়, কারণ একা বের হলেই পাখিরা উড়ে এসে তাকে ঘিরে ফেলবে, সে যে চিৎকার করছিল, আমাকে মেরে ফেলল, শোভা আবু দৌড়ে বাড়ি উঠে খবর না দিলে, পাখিরা হয়তো সত্যি ঠুকরে তাকে খেয়ে ফেলত? শোভা আবুও বলেছে, কত পাখি কোথা থেকে সব উড়ে আসছে। এদের মধ্যে দু'চারটে ঈগল পাখিও থাকতে পারে।
কারণ সেবার জলা থেকে একটা ঢাই বোয়াল মাছ তুলে ঈগল পাখি আকাশের নীচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।
পাড়ার সনাতনই চিৎকার করে উঠেছিল— ওই দ্যাখো ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের দিঘি থেকে মাছটা তুলে নিয়ে গেল।
জিতুর ক্ষোভ তৈরি হয়। আর কোনও জলা পেল না, তাদের পুকুর থেকেই মাছটাকে তুলে নিয়ে গেল! কী সাহস!
জিতুরা অবশ্য দিঘি বলে না। খুবই বড় জলা, তবে দিঘি বলা ঠিক কি না সে জানে না। তারা, এমনকী জেঠুও বলবে।
এদিকে দেখলেই জেঠু বলবে, পুকুর পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি কেন?
জেঠু কী করে বলে, সেই ঈগল পাখিটা উড়ে এসে যদি আবার গাছের ডালে বসে, বিশেষ করে সেই বড় বৃক্ষের মগডালে ফিরে এসে বসতেই পারে। সে বলেছিল, পুকুরপাড়ের বেত ঝোপে এই এত বড় একটা বোলতার চাক হয়েছে জেঠু! যেন সে কই মাছ ধরার জন্য বোলতার চাক খুঁজছে। ঈগল পাখি খুঁজছে না।
প্রতি বর্ষায় তাদের দিঘি জলে ডুবে যায়— রাজ্যের জিয়ল মাছ এসে তখন পুকুরটায় আশ্রয় নেয়— কারণ এত গভীর এ-অঞ্চলে আর জলা পাবে কোথায়! বড় বড় লাল বুকওয়ালা কইমাছ বোলতার ডিম বড়শিতে গেঁথে ফেললেই ফাতনা টেনে নিয়ে যায় মাছে। বড় বড় কইমাছ অঘ্রাণ পৌষমাসে বোলতার ডিম খুব পছন্দ করে—
একেবারে মিছে কথা। কারণ পকেটে তার গুলতি দেখলেই সেটা বোঝা যায়। এক ফাঁকে গুলতিটাও সে লুকিয়ে ফেলেছিল।
জেঠু যদি বলতেন, কোথায়, দ্যাখা।
তা হলেই ধরা পড়ে যাবে, সে সহজেই মিছে কথা বলে পার পেয়ে যেতে চায়— সে বলে জানো জেঠু, খালে বানা ফেলে এত এত মাছ ধরছে পদ্মর কাকা।
জেঠুরও মাছ ধরার খুব নেশা আছে। বাড়ির হরিদাদা, কর্তার পছন্দমতো টোপ তৈরি করে রাখে— বোলতার চাক পেলে তো কথাই নেই, সে যে ঈগল পাখি টাকে শায়েস্তা করার জন্য পুকুর পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে— ঘুণাক্ষরেও জেঠু বুঝতে পারল না। পদ্মর কাকার মাছ ধরার মিথ্যে গল্প বলে পার পেয়ে গেল।
সেদিন পাখিটা এত নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল যে বোয়াল মাছ না রুইমাছ বোঝা যাচ্ছিল না। সে পাখিটার পিছনেও দৌড়েছিল— তাদের দিঘি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, মাছটার সঙ্গে পাখিটার লড়ালড়ি চলছে।
মাছটা লাফাচ্ছে।
পাড়ার কাচ্চা-বাচ্চারা মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে। সেও ছুটছে। তবে জেঠু জানে না, পাখিটা উড়ে যাচ্ছে, মাছটা লেজে বাড়ি মারছে, খাবার মধ্যে মাছটা ছটফট করছে— মাছের আর ঈগলপাখির লড়ালড়ি দেখার মজা যে কী মারাত্মক ছুটে না গেলে বুঝতে পারত না।
সেই দু-পক্ষের লড়ালড়ি।
আদিমকাল থেকে হয়ে আসছে। পাখিটা যত মাছটার পিঠে নোখ গেঁথে দেবে, মাছটা তত ছটফট করবে। টিকে থাকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কাজেই এই মাছ নিয়ে উড়ে যাওয়ার মধ্যেও কিংবা মাছটা যে তাদের দিঘি থেকে তুলে আনা হয়েছে, যদি থাবা থেকে ছুটে যায়, মাছটার অধিকার তার। সেও ছুটছিল সবার সঙ্গে।
তার পিছনে সনাতন।
তার পিছনে শোভা, আবু, সিদু, নীল আকাশের নীচে একটা সোনালি ঈগল— ভাবা যায় না, থাবায় একটা অতিকায় মাছ দাপাচ্ছে— জিতু থাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে? সে দু'বার গুলতি থেকে গুলিও ছুঁড়েছিল, লাগেনি।
এত দুঃসাহস পাখিটার! মাছটা যে তাকে কেড়ে নিতেই হবে। গুলি লাগলেই থাবা হালকা হয়ে যাবে ঈগলের। আর ধুপ করে জমিতে পড়ে গেলে, তারই অধিকার মাছটার।
কারণ জিতু তখন দেখেছিল ট্যাবার পুকুরপাড়ে বিশাল একটা ঝাউগাছের ডালে বসে পাখিটা মাছের মাথা ফুটো করে দিচ্ছে।
শীতকাল এলেই পাতা ঝরার পালা শুরু হয়। ঝাউগাছের পাতা ঝরছে। ঝরে ঝরে ন্যাড়া গাছ হয়ে যাচ্ছে। মরা গাছ মনে হয়। গাছটার নিচু ডালে ঈগল পাখি। মাছটা এখনও লেজ নাড়ছে। লেজ নাড়লেই ঠুকরে দিচ্ছে এবং পাখা মেলে ডালে রাজার মতো বসে আছে। হাওয়া কোনদিকে বয় বাতাস শুঁকে টের পাবার চেষ্টা করছে।
ধারালো থাবার মধ্যে মাছটা একইভাবে ছটফট করছিল।
ট্যাবার পুকুরপাড়ে অজস্র গাছপালা, জঙ্গল। দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার হয়ে থাকে পুকুরের চারপাশ।
ঝোপ জঙ্গল ডেঙিয়ে গাছটার নীচে যাওয়া কঠিন। কিন্তু জিতুর জেদ, সে যাবেই।
তাদের পুকুর থেকে মাছটা তুলে আনা হয়েছে— মগের মুল্লুক ভেবেছে, কেউ দেখার নেই ভেবেছে— এত সাহস তোমার!
তুমি একটা ঈগলপাখি, আর আমি একজন মনুষ্যের অপোগন্ড, তোমার চুরি করা মাছ ছিনিয়ে নিতে না পারলে আমার শান্তি নেই।
কিন্তু গাছটার গোড়ায় না গেলে চলবে না।
পাখিটাকে গুলতির পাল্লায় পেতে হলে গাছের গোড়ায় না গিয়ে উপায় নেই।
সামনে বেতগাছের জঙ্গল, তার কাঁটা ঝোপ, সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না।
কাঁটায় জামা ছিঁড়ছে, পিঠে আঁচড়, তার শরীর থেকে রক্তপাত হচ্ছে, তবু সে যাবে। গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে গুলতির পাল্লায় পাখিটাকে পাবে না। সে কোনওরকমে সন্তর্পণে পুকুরের হাঁটুজলে নেমে গেল। কচুরিপানায় ভরতি পুকুর।
ঈগলের লাল চক্ষু, ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন। সে খুব সন্তর্পণে কোমর জলে নেমে গেল— তাকে দেখতে পেলেই উড়াল দেবে।
বিশাল পাখা মেলে আবার উড়তে শুরু করবে। তারপর কোথায় হাওয়া হয়ে যাবে টেরও পাবে না।
পুকুরে কচুরিপানা থাকায় তার সুবিধা হয়েছে। ইচ্ছা করলে কচুরিপানার নীচে ডুব সাঁতার দিতে পারে এবং ঠিক গাছের গোড়ায় গিয়ে ভেসে উঠতে পারে।
পকেটে পোড়াগুলি তার, পাথর হয়ে আছে, পাথরের গুলি কোথায় লাগে! জলে ভিজলেও ক্ষতি নেই। পোড়া ঠিকমতো না হলে, শত হলেও মাটির গুলি জলে গুলে যেতে কতক্ষণ। জলের নীচে সে পকেটের গুলি টিপে টিপে দেখল। ঠিকই আছে— পোড়াগুলি জলে ভিজেও গলে যায়নি, পাথর হয়েই আছে।
ঈগলটাকে বুঝতেই দেবে না, শমন তার পিছু নিয়েছে। ঝোপ-জঙ্গল থাকায় তার সুবিধাই হয়েছে।
কারণ ট্যাবার পুকুরপাড়ে সেই আদ্যিকাল থেকে এই সব ভুতুড়ে জঙ্গল গাছপালা— মানুষজন ভয়ে দিনের বেলাতেই এদিকটায় কেউ আসে না। আসে মাত্র একজন— বড় বড় পা, ভীমাপদ নাম তার। লোকটার বিশাল জটা মাথায়, মুখ বিশাল গোঁফ দাড়িতে ঢাকা। কটকটে লাল চোখ। লাল রঙের একটা কৌপিন পরনে।
তবে ভীমাপদকে জিতু ভয় পায় না।
মহা অষ্টমী ব্রতের দিনক্ষণ জানতে সে বছরে একবার তাদের বাড়িতে আসবেই। তখন ছোট বড় সবারই পায়ের ধুলো নেয় সে।
তাকে দেখলেই বলবে, এই যে জিতুঠাকুর খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছেন দেখছি। জিতু জানে মহাষ্টমী ব্রতের দিন তার স্ত্রী মারা গেছে। অবশ্য লোকে বলে

বউকে খুন করে সে পালিয়ে গেছে. আর এ-দেশে আসবে না। সেই ভীমাপদই বলেছিল জেঠুকে, একটা বিধান দেন। আমার স্ত্রীর আত্মার সদগতি যদি হয়।

সে যে চন্দ্রসিদ্ধ মানুষ জিতু তাও জানে। ভীমাপদই বলেছিল, ভীমাপদই আপনারা আসবেন, ট্যাবার বটতলায় মোচ্ছব হবে। আপনার জ্যাঠার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে গেলাম।

সেই বলেছিল আমাকে আপনেরা ভয় পান ক্যান। আমি তো শক্তির আরাধনা করি— আপনের জ্যাঠা জানে। আপনেরা আমার কুলগুরু— ভূত-প্রেতের গন্ধ পেলে আমার স্মরণ নিবেন।

সে অন্দরে ঢুকে মা জেঠিমাকেও প্রণাম করে যায়। ঠাকুরমা বলেছিলেন, দেশের কথা মনে পড়ল, বউ মরল আর বিবাগি হয়ে গেলি। থানা পুলিশ তোকে কিছুই করতে পারল না। বউ এর জন্য মায়া হয় দেশে ফিরে আসি— তারপর তোর মচ্ছব শুরু ট্যাবার পুকুরপাড়ের বটগাছটার নীচে। সেখানে তুই গাঁয়ের ছেলেদের লাবড়া খিচুড়ির পায়েস খাওয়াস।

আসলে লোকে বলে ভীমাপদ ভূত-প্রেতের আরাধনা করে। এবং ট্যাবার এই পরিত্যক্ত পুকুরপাড়েই একটা ছই বানিয়ে কিছুদিনের জন্য থিতু হয়। যাগ যজ্ঞ করে। জিতুর দাদারা সেও অবশ্য সঙ্গে থাকে ঠাকুরের হাতে প্রসাদ খাবে বলে খিচুড়ি পায়েসের আয়োজন। জিতুকে বলেছে, গুপ্তধনের সন্ধানে আছি। যে-কোনও সময়ে পেয়ে যেতে পারি। আপনের-অ একটা হিস্যা থাকবে।

ভীমাপদ গাজা ভাঙ খায় জিতু তাও টের পেয়েছে। সে তার কথার গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু একদিন সকালে সে কেন যে বলে গেল অশ্বিনি কয়ালের গোলাঘরে একটা পদ্মগোখরা থাকে। লক্ষ রাখবেন, ফণা তুলে কোনদিকে যায়। ভীমাপদ মিছা কথা বলে না। আমি একখান আপনের নামে গুরুমন্ত্র ছেড়ে দিয়েছি। ভূত-প্রেত আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ভীমাপদর এই একখান কথাই তার যে সহায়।

যতই ঘোর বনজঙ্গল হোক সে ভয় পায় না। শোভা আবু কিরণী তো জানে না, সে শুধু গুলতি ছুঁড়ে পাখির মাথাই মটকে দেয় না, ইচ্ছে করলে ভূত-প্রেতের মাথাও ভেঙে দিতে পারে।

তার অসীম সাহস। যারা এতক্ষণ মাঠের উপর দিয়ে তার সঙ্গে ছুটেছিল, তারা এখন এই ট্যাবার বনজঙ্গলে জিতু ঠাকুরকে ঢুকতে দেখে— ভয়ে আর এক পাও এগোল না। যদি ভীমাপদ ফের হাজির হয়। কারণ এই এখানটাই ভীমাপদর পছন্দ। ভীমাপদ নিজেই একটা ভূত কি না, কারণ বছরে দু'বছরে—

তার হাতের চিমটা বাজালে ভূতেরা না কী নৃত্য করে এমন কথাও চাউর আছে গায়ে গঞ্জে। সে যে একজন সিদ্ধাই পুরুষ, জিতুঠাকুরের মুখ থেকে অনেক লীলাখেলার খবর পেয়েছে তারা পদ্মগোখরো সাপেরও।

গুপ্তধনের মাথায় তার সাথী পাওয়া যায়। তারপর সে যে কোথায় যায় কোথায় থাকে কেউ জানে না। সেই পদ্মগোখরো বসে আছে। পাহারা দেয়। তবে কোথায় আছে কেউ জানে না। গোখরো সাপটা কোমর সমান ফণা তুলে ছুটলেই বুঝতে হয় বের হয়েছে কাল নাগিনী— কাউকে সে খাবে অথবা অশ্বিনী কয়ালের গোলাঘরে যদি থাকে—

এ-কথা কেন বলছেন ঠাকুর আপনি তো সুযোগ পেলেই বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ান— একদিন না একদিন তার সঙ্গে আপনার দেখা হবেই। পারবেন ঘাড় মটকে দিতে, গুপ্তধন তাহলে আমাদের হাতে চলে আসে।

সে অবশ্য সাপখোপ যে দেখে না তা নয় তবে অতিকায় সেই পদ্মগোখরোর দেখা পায়নি। দেখা হলে টিপ যাতে না ফসকায়, সেজন্যই পাখি কাঠবিড়ালি মেরে হাত মকস করছে— আজই তেমনি হাতের নাগালে পেয়ে গেল ঈগল পাখিটাকে। পাখিটার পায়ের থাবায় বোয়াল মাছটা ঝুলছে।

সে একদিন প্রশ্ন না করে পারেনি, আরে মেরে ফেললে তো ল্যাটা চুকেই গেল। কোথায় সেই গুপ্তধন বুঝবেন কী করে!

ঠাকুর কিছুই বোঝেন না। অশ্বিনী কয়ালদের আট পুরুষের এই প্রাসাদ। এখন জরাজীর্ণ দেখছেন, এককালে লক্ষ্মী ঠাকুরণ অশ্বিনী কয়ালরা পূর্বপুরুষদের হাতে বাঁধা ছিল। এত জয়সয় যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িতে দুর্গোৎসব। মা দুগ্গার শাড়িখানা সোনা আর মণিমুক্তায় খচিত বোঝেন! বউরা সব মণিমুক্তায় সজ্জিত হয়ে মণ্ডপে আসতেন।

সপ্তমীতে তেরোখানা পাঁঠাবলি।

অষ্টমীতে শেষ বলি।

কটা মেষ।

তেরোটা।

নবমীতে ভেড়া বলি।

ক'খানা।

তেরোখানা। প্রাসাদে তোপধ্বনি হত। সপ্তমী অষ্টমী নবমী— এই তিন দিন যত দূরেই থাক সেই তোপধ্বনি, সবারই আমন্ত্রণ। প্রসাদ নিতে সার বেঁধে লোকজন আসত। মণ্ডপে, কাছারিবাড়িতে দিঘির পাড়ে সার বেঁধে বসে যেত মানুষজন।

জানেন তো অশ্বিনী দেওয়ানের দিঘিতে একটা থামের মতো গজার মাছ আছে। গায়ে বড় বড় চক্র— সেখানও মণিমুক্তা সেট করা। অনেক ভাগ্যবানই দেখেছে।

আমি তো সারা বছর দিঘিরপাড়েই পড়ে থাকি। কখন ভাসবে। কখন শ্বাস ফেলবে— যদি তখন একখান তুবড়ি বাজি জ্বালিয়ে মুখের ভিতর ফেলে দেওয়া যায়।

জিতু বলেছিল, আমি জানি।

আপনি দেখেছেন! আপনি কি জানেন?

আমার ঠাকুরদার পিতা ঠাকুর দেখেছেন— রাসপূর্ণিমায় একবার তিনি ভেসে উঠেছিলেন, ভেসে উঠলে এত আলো ঠিকরেছিল যে, আমার ঠাকুরদার পিতা অন্ধ হয়ে গেছিলেন।

তখনই জিতুর মনে হল, মাছটা আবার দাপাতে শুরু করছে। সে মাছ এবং পাখিটার কথা ভুলেই গেছিল। তার যে কী হয়, ট্যাবার এই পরিত্যক্ত নির্জন এলাকায় ঢুকেই ভীমাপদর কথা মনে পড়ে গেল—

আর সে দেখল মাথার উপরে মগডালে ঈগলপাখিটা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে দেখছে। চোখ জ্বলছে, দু' চোখেই আগুন ফুটছে।

মনে রাখা দরকার, জিতুর দেশটা একটা জলাদেশ।

বছরে ছ'মাস ঘাটি-প্রান্তর, নদী-নালা পুকুর-ডোবা সব জলে ডুবে থাকে।

বৈশাখ মাসে কালবৈশাখি দিয়ে শুরু।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ ঘন কালো।

আষাঢ় শ্রাবণে ধারা বর্ষণ।

নদী ডুবে যায়। তার জল উঠে আসতে থাকে।

বাড়ির উঠোনেও জল উঠে যায়।

এবং বাড়ি সংলগ্ন সবারই পুকুর থাকে, পুকুরে একখানা করে কাঠের নাও ডোবানো থাকে।

সারা দেশ, যতদূর দেখা যায়, এমনকী পদ্মাপাড়ে গেলেও দেখা যাবে কোথাও এতটুকু স্থলভূমি নেই। বাড়িঘর গেরাম সবই বলতে গেলে জলের নীচে— উঁচু ডাঙায় একখান শ্মশান আছে, তাও যদি ডুবে যায় মানুষ মরে গেলে তার দাহ হয় নৌকায়।

আস্ত একখান কোষ। নাওএর পাটাতনে কাঠ সাজিয়ে মৃতকে শুইয়ে দেওয়া হয়।

তারপর ফের কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়— তারপর আগুন ধরিয়ে তারপর নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

নদী যায়, নদীর স্রোতে নেমে যায়, নাওখানি ভেসে যায় তখন একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে। অগ্নিকুণ্ডটি ভাসতে ভাসতে একসময় টুপ করে ডুবেও যায়। নদীরপাড়ে মানুষজন দাঁড়িয়ে থাকে। যতদূর দেখা যায় দেখে তারপর আগুন জলে ডুবে গেলে তারা জোড়হাত করে প্রণাম জানায়।

এ-ভাবে জলাদেশের মানুষদের বর্ষাকালে নৌকাই সম্বল। ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকে। আত্মীয় স্বজনরাও সব তখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যায় বেড়াতে। আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখতেও এই নৌকাই ভরসা।

এমন একটি দেশে সোনার নাও পবনের বৈঠারও খবর পাওয়া যায়।

যেমন বারো ভূইঞার এক ভূইঞা নবাব ঈশাখাঁকেও দেখা যায়, সঙ্গে তার সোনাই বিবি, ফাঁউসার বিলে হাওয়া খেতে বের হয়েছেন— এ-বিল তো সে-বিল নয়, ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে গেছে বিলের সীমানা। অজগর সাপ গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে জলে। অজগরের মুখেও সে শুনেছে, সাতরাজার ধন এক মানিক থাকে। কাজেই পদ্মগোখরো গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে বেশি কী— এমন কী দেখল পাখিটাকে যদি নামিয়ে আনা যায়, তার দু'চোখেও যে মণি নেই কে বলবে।

আকাশের নীচে জিতু আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও অস্তিত্ব আছে টের পেত না। হয় তুমি আছ নয় আমি আছি— এই খেলা আজন্মকাল থেকে মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়। জিতুর আচরণে এটা টের পাওয়া যেত।

এই গভীর জঙ্গলে জিতুঠাকুরই ঢুকতে পারে।

সনাতন কল্পনা আবু শোভা কিরণী কিংবা আর যারা ঈগলের পিছনে মাঠ ধরে দৌড়ে আসছিল— তারা দেখল জিতুঠাকুর জঙ্গলে মুহূর্তে অদৃশ্য।

ভীমাপদর কথা মনে পড়তে পারে তাদের। ভীমাপদ ভূতের নাম ধরে ডাকলে তড়িঘড়ি তারা হাজির হয়। এবং ভূতরা খুবই শান্তিপ্রিয় এটাও তারা জানে— তবে ভূতেরা কোনও লড়ালড়ি সহ্য করে না।

ভূতেরা ইচ্ছে করলে যে-কোনও ছদ্মবেশ ধরতে পারে। ইচ্ছা করলে মানুষকে পাঁঠা ছাগল বানিয়ে দিতে পারে এও শুনেছে তারা।

আসলে ঈগলপাখিটা যে ছদ্মবেশে উড়ছে, অর্থাৎ তেনারাই তাকে উড়িয়ে দিয়েছেন, বোয়াল মাছের ভোজ, জিতুঠাকুর সেই ভোজের এখন বিঘ্নস্বরূপ, ভূতেরা ক্ষেপেই যেতে পারে। শত হলেও ভূতের আস্তানা এবং ভূতেরা এখানে সুখেই আছে। ভীমাপদ ভূতের কল্যাণে বড় বটগাছটার নীচে মচ্ছব লাগায়। গাঁয়ের কাচ্চাবাচ্চারা সব আসে, বাবা মা-রাও পাঠিয়ে দেয়, কারণ ভূতকে কমবেশি সবাই ভয় পায়। শিশুদের কল্যাণের কথা ভেবেই মচ্ছবে সবাই সেজেগুজে চলে আসে। আর গাঁয়ের কল্যাণেই তার যে এই ভূতপূজা। এমনকী, জিতুঠাকুরের জ্যাঠা পর্যন্ত ভীমাপদকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

আজ্ঞে কর্তা আমায় ডেকেছেন!

ডাকলাম, কী করি বল। জিতুর বড় কঠিন অসুখ তুই তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যা। একটু ঝাঁড়ফুক, যা ভাল মনে হয় করে যা।

ঠাকুমাই বলেছিলেন, মণি তুই ভীমাপদকে ডেকে পাঠা। সে নাকি আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে। সে নাকি খুবই তন্ত্রমন্ত্র জানে। ভূতের নজরে পড়ে গেছে কিনা তাও তো বুঝতে পারছি না। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস কর— সে যদি কিছু সুরাহা করতে পারে।

ভীমাপদর সেই উগ্রমূর্তি, জলদস্যুর মতো চেহারা, চিমটা বাজাতে বাজাতে বলল, জিতুঠাকুর কোথায়?

শুয়ে আছে।

বাড়িটা ঠানদি বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি। ভূতের চোদ্দোগুষ্টির সাহস হবে না বাড়িতে ঢোকার। চিন্তা করবেন না। জিতুঠাকুর ঠিক ভাল হয়ে যাবে।

জিতু গাছটার গোড়ায় বসে দেখল, মাছটা এখনও লেজ নাড়ছে।

ঈগলটার কোনও হুঁশ নেই।

উদাসী ঈগলের পাখা মেলা।

সে যেন, যে-কোনও সময় উড়ে যাবে।

পাখা মেলে পাখিটা জোরও পায় বোধ হয়।

হাওয়ায় আর পাখির বিশাল দুই পাখার জোরেই মাছটাকে যে জব্দ করে রেখেছে। আর স্বচ্ছ তার ধারালো ঠোঁটে।

সে চারপাশে আরও বড় গাছ খুঁজতে পারে। জিতুকে কি দেখতে পেয়েছে, এমন ভাবল জিতু।

সে জম্পেস করে বসে পকেটে হাত দিল, সে শক্ত পোড়া গুলি খুঁজছে।

উদাসী ঈগলের কী বিশাল দুটো পাখা। জায়গাটিকে পাখা মেলে এক বিশাল ছায়া তৈরি করছে।

এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সে কোনওদিন নাগালে পায়নি।

এটা তার কাছে জীবন মরণের চেয়েও অধিক কিছু।

সে সন্তর্পণে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সবকটা গুলি বের করে একটা কচুরিপাতায় বিছিয়ে রাখল।

টিপে টিপে দেখল। পাথরের চেয়ে কোনও শক্তগুলি যদি থাকে।

সে নিজে গভীর জলা থেকে কাদামাটি ডুব দিয়ে তুলে আনে— যত গভীর জল, তত তার নীচে থাকে শক্ত কাদামাটি।

গুলি বানাবার এই প্রক্রিয়া সে জানে, ভীমাপদই বলেছিল, লোহার মতো শক্তগুলি বানাতে হলে চাই গভীর জলের মাটি। সেই সব মাটি পাওয়া যায়, বিলের দিঘির তলদেশে— এত গভীর জলে ডুব দিতে কারও সাহস নেই। তুই পারবি, তোর সাহস আছে। জলে ডুব দিলে চোখে তোর বিশ্বচরাচর ভেসে উঠবে। বলা যায় না সেই কিংবদন্তির গজার মাছটাকেও দেখতে পাবি। কখন দিঘির জলে ভেসে উঠে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, আজ পর্যন্ত কেউ দেখেছে বলে জানা যায় না। তার শরীরে মণিমুক্তা জড়ানো— সেও আর এক গুপ্তধন মনে রাখবি।

সে পুকুরে ডুব জলের অন্তহীন গভীরতা থেকে আঁঠালো মাটি তুলে আনে। শোভা আবু তাদের পাশের বাড়ির মেয়ে। ফ্রক গায়ে দেয়।

জিতুকে বের হতে দেখলেই তারাও দল বেঁধে বের হয়ে আসে। জিতু কোথাও কোনও অকর্ম করতে যাচ্ছে।

এই তোরা কোথায় যাবি।

তুই কোথায় যাবি।

আমি যাব কাদামাটি তুলতে। দিঘির গভীর জল থেকে মাটি তুলে আনতে হবে। তোরা গিয়ে কী করবি।

মজা দেখব।

জিতু আর কিছু বলে না। তারা সঙ্গে গেলে জিতুঠাকুরের ভয়ঙ্কর অভিযানের শরিক হয়ে যাবে।

তারা বড় হচ্ছে। প্যান্ট ফ্রক পরলেও জিতু বোঝে তারা বড় হচ্ছে। তার দলবল বলতে পাড়ায় এই মেয়েগুলি। পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এমন একটা ভয়াবহ দিঘি, দিঘির মধ্যেই বসবাস করে সেই সোনালি গজার মাছ— কিংবদন্তি পূর্ণিমায় কিংবা অমাবস্যার গভীর রাতে যখন চরাচরে কেউ জেগে থাকে না মাছটা ভেসে উঠেই সোজা পাখনা মেলে দিঘির জলে সাঁতার কাটে।

দিঘিতে এমন একটা আজব জীব জলের অন্তরালে ঘুরে বেড়ায়। এত গভীর জলে মাছটা তার বসবাসের জায়গা পেয়ে গেছে। দিঘির পাড় দিয়ে হেঁটে যেতেও ভয়। আতঙ্ক বলা যায়। কেউই সচরাচর দিঘির পাড় দিয়ে হাঁটে না, কারণ ওটা মাছ না রাক্ষস, তাও কেউ জানে না। যদি বিশাল অজগর হয়, কখন কাকে গিলে খাবে তাও তারা জানে না। পরিত্যক্ত এক দিঘিতে। যতদূর চোখ যায় শুধু জলজ ঘাস। দিঘির মাঝখানে জল টল টল করছে। মাছটার যে গতিবিধি এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ এও তারা জানে।

জিতু একবার কাদামাটি তুলতে গিয়ে দেখেছে, দিঘির তলদেশের জায়গাটি মসৃণ। মাছটার যে এটাই আস্তানা সে তাও বোঝে। তবে ডুব দিলে অনন্তকাল জলের নীচে দিঘির জলে-জঙ্গলে সে আটকাও পড়ে যেতে পারে। শ্যাওলা আর দিঘির এই অঞ্চলটায় যে মাছটা ঘুরে বেড়ায় তাও সে বোঝে।

তার ধারণা, মাছটা তাকে গিলে খাবার জন্য হাঁ করে ছুটে এলেই গুলতির পোড়ামাটির গুলিতে হাঁ করা মুখ ঝাঁজরা করে দিতে পারে। মাছের অভ্যন্তরে পৌঁছে দিতে পারলেই, সেই অতিকায় রাক্ষুসে মাছটা খতম হয়ে যাবে। জলে ডুব দেবার আগে সে দম বন্ধ করে নেয়— এত নীচে কাদামাটি যে স্ফটিক জলে যতই অভ্যন্তরে সে নেমে যাক, সে কেবল দেখতে পায় অজস্র জঙ্গল চারপাশে। শ্যাওলা আর দামে ভরে আছে। শ্যাওলা আর দাম ফাঁক করে কিছুটা নেমে গেলে, জঙ্গলও নেই, ঘাসপাতাও নেই, বিশাল এলাকা জুড়ে কালোমাটির এক সমতলভূমি। এবং এখানেই বোধ হয় মাছটার আশ্রয়।

শোভা আবু কিরণী জানে এক দুর্গম অঞ্চল থেকে জিতুঠাকুর তার নেশার ঘোরে সঠিক কালো মাটির খোঁজে থাকে।

আর জিতু আশা করে সেই নিশাচর প্রাণীর সঙ্গে কখনও না কখনও তার ঠিক দেখা হয়ে যাবে। ঠাকুমার সেই ডালিমকুমারের প্রস্তাবের মতো সে সেখানে পলাতক অশ্বটিও খুঁজে পেতে পারে।

ডুব দেবার আগে এই সব ভেবে নেয়।

তারপর ডুব দেয়।

অনেক দূরে ছোট ছোট পুতুলের মতো জিতুঠাকুরের অসীম সাহসের মজা দেখার জন্য তারা দাঁড়িয়ে থাকে। দেবতাদের অভিশাপে বৈশ্বানরকে সমুদ্রের নীচে দীর্ঘদিন পলাতক থাকতে হয়েছিল। সেই অশ্বটি যদি শেষপর্যন্ত আরও গোপন আশ্রয়ের জন্য এই হ্রদে পালিয়ে থাকে। যদি সেই গজার মাছটা দেবতাদের শাপেই এই হ্রদের মতো দিঘিতে আশ্রয় নেয়। আর বলা যায় না অর্জুনের পলাতক অশ্বটিকে নিয়েও উঠে আসতে পারে। অর্জুনের পাঁচ ভাই। দ্বিগবিজয়ে বের হয়ে সেই যজ্ঞের অশ্বটিকে আর তার গজার মাছের খোঁজ পায়নি। বৈশ্বানর না কী নাম যেন তার।

অজগরের সঙ্গে অথবা বলা যায় সেইসঙ্গে যদি অশ্বটির বন্ধুত্ব হয়ে যায়— অর্থাৎ জিতু জানেই না, প্রকৃতই এই সমস্ত দিঘির মাঝখানে, কিংবা জলের নীচে কার বসবাস।

সে ডুব দিলে স্ফটিক জলে ঘোলা মতো এক বিশ্বচরাচর তার সামনে নেমে আছে।

কোনও মাছ নেই, কোনও কচ্ছপেরও দেখা নেই— সব গজার মাছটা সাবাড় করে দিয়েছে। একটা কাঁকড়া পর্যন্ত।

উপুসি মাছ হলে যা হয়, যাকে পায় তাকেই খায়, তাকেও গিলে ফেলতে পারে।

তবে তার পকেটে পোড়া গুলি আর গুলতি আছে। তাকে গিলে ফেলা অত সহজ নয়। একই সঙ্গে সে দেবতাদেরও কাণ্ড কারখানা জেনে ফেলতে পারে। অশ্বটি অথবা গজার মাছটিকে দেবতাদের দূত এমনও মনে হয় তার।

খুব নির্জন এলাকায় কোনও বৃক্ষের খোঁজ পেলেও তার মনে হয় এই সেই বোধিদ্রুম, যার নীচে সিদ্ধার্থ সাধনায় বসেছিলেন, এবং গৌতম বুদ্ধ বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

তার ইচ্ছে হয়, যেমন ভীমাপদ তান্ত্রিক সাধক হয়ে গেল। ভীমাপদকে কথায় কথায় ডেকে পাঠানোর মধ্যে যদি কোনও গুপ্তমন্ত্রের খোঁজে থাকেন জেঠু।

জিতুর মাথাটাই বিগড়ে যাচ্ছে।

যদি ভীমাপদ জিতুকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন।

ভীমাপদকে দেখলেই সে এখন পালায়।

আর সে তখন হ্রদের তলদেশ থেকে একদলা কাদামাটি নিয়ে ভেসে উঠছে।

জিতুর কত কিছু যে মনে হয়।

সবসময় তার মধ্যে কিছু আজগুবি ভাবনা থাকে। আসলে ওটা গজার মাছ না অজগর কে জানে!

এক হাতে এক তাল মাটি নিয়ে সে তখন সাঁতার কাটছে। এই সময়ই তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়, অজগর সাপটা ধেয়ে এলে তার কিছু করার থাকবে না। কারণ এক হাতে তার কাদামাটির তাল, তালুতে ভর করে তুলে আনছে। এই সময় সে তার গুলতি ব্যবহার করতে পারবে না। এক হাতে তো গুলতি ছোড়া যায় না। বিষয়টা যদি গজার মাছটার বোধগম্য হয়ে যায়, হতেই পারে কারণ তারা যদি প্রকৃতই দেবতাদের দূত হয়ে থাকে তবে আগাম খবর তারা পেতেই পারে।

সে পাড়ের কাছে এসেই, আবু শোভা কিরণী আরও কেউ কেউ বিস্ময়ে হতবাক।

তুই তুলে আনতে পারলি! তোকে গজাল মাছটা যদি খেয়ে ফেলত!

জিতু কিছুই গ্রাহ্য করে না। যেন গভীর জলের নীচে ডুবে থাকলে বৈশ্বানরকে দেখা যায়। তিনি আগুনের দেবতা। জলের মধ্যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও দেখা যায়। এবং এক গভীর অনুভবের মধ্যে ডুবে যাওয়া যায়। বিশ্রবা মুণির পুত্রদের সঙ্গেও দেখা হতে পারে। কুবের, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। শ্বাস নিতে কষ্ট হলে জলের নীচে তার চোখে সরষে ফুলও ফুটতে দেখে। কুবের, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ তারা তো দেবতাদেরই অংশ বিশেষ তারা অজেয় অমর। অথচ তাদের মহাভারত ছাড়া খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মনে হয়, এই হ্রদের গভীর জলায় জলজ ঘাস এবং ঘাসবনের মধ্যে তারা লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে না থাকলে তারা যাবে কোথায়।

জিতু গাছের নীচে বসে ঈগলটাকে দেখতে দেখতে কত কিছু যে ভাবে।

লক্ষ্যভেদে তারপর সে নিযুক্ত হয়। সে মাথাটা দেখতে পাচ্ছে, তারপর চোখ দেখতে পাচ্ছে— এবং গুলতি থেকে তার পাথরের গুলি সাঁ সাঁ করে ছুটতে থাকলে সে আর ঈগলটাকেও দেখতে পায় না। শুধু চোখ দেখতে পায়— ধপাস করে হুড়মুড় করে পাখি বোয়ালমাছ সহ তার শরীরের উপর এসে পড়লে সে বুঝতে পারল পাখিটার মৃত্যু হয়েছে। বিশাল বোয়াল মাছটা থাবা থেকে খসে গেছে। আর আবু কিরণী শোভা ছুটছে, সঙ্গে আরও গাঁয়ের ছেলেরা, মেরেছে, মেরেছে। জিতু পাখিটাকে মেরেছে।

তারপর যা হয় তারা দেখতে পায় জিতুর পিঠ রক্তাক্ত— নখের আঁচড় পিঠে। তারপরই তার বোধ হয় সেই কঠিন অসুখ হৈমন্তি। নেফ্রাইটিস— চিরজীবনের জন্য তাকে খোঁড়া করে দিল। তার দস্যুবৃত্তি শেষ করে দিল। আমার বাল্যকালও শেষ হয়ে গেল হৈমন্তি।

হৈমন্তি সোফায় শরীর এলিয়ে বসে আছে। সে শুনছে, তবে সাড়া দিচ্ছে না।

তিনি বললেন, রাগ করছ।

না রাগ করার কী আছে।

হৈমন্তি ডাকলাম বলে।

সে যা খুশি ডাকুন।

আরে তুমি বুঝছ না কেন, তুমি যদি তখন হৈমন্তি হয়ে না আসতে তোমাকে পেতাম কোথায়।

হৈমন্তি বলল, আমার বাল্যকাল বলে কিছু নেই। কারণ আমি বিমাতার কাছে মানুষ হয়েছি। তাঁর ভাইরা কখনও আমার ইচ্ছেতে, কখনও তাদের ইচ্ছেতে আমি তাড়িত হয়েছি। নারীর কোনও দস্যুবৃত্তি থাকে না। তার সে ক্ষমতাও নেই।

তিনি কোনও জবাব দিচ্ছেন না।

সুরমা ডাকল বাবু আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঘর অন্ধকার করে তারা বসেছিল— শুধু সামনের জানালা খোলা— বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধ আসছে। দরজায় জ্যোৎস্না, দূরে রেল লাইন— একটা লোকাল চলে গেল, কী হল। সাড়া দিচ্ছেন না। সে তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালল। এবং দেখল মানুষটির চোখে এক অপার শূন্যতা।

কেমন তাঁর হুঁস নেই।

কী হল!

তারও জবাব নেই।

তাড়াতাড়ি সুরমা উঠে গেল, এবং আলো জ্বেলে দিল। আলোটা তাঁর চোখে যে সহ্য হচ্ছে না বুঝতে পারছে সুরমা।

আপনার কী হয়েছে! কথা বলছেন না কেন!

তারপরই কেমন হুঁস ফিরে এল, তিনি বললেন, আমাকে ডাকছ।

আপনার কী হয়!

তিনি বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি না, চিনতে পারি না, কোথায় আছি তাও, কেন আছি— আমার যে কী হয়— এক অপরিসীম শূন্যতা আমাকে কেন মাঝে মাঝে গ্রাস করে? আমার পাশে আমি থাকি না, কেউ থাকে না। কে যেন ইশারায় বলে যায়— শুধু এক জন্মের রহস্য।

আমি ডাকব!

কাকে।

আপনার বাড়িতে খবরটা দিতে হবে।

তারা জানে।

কোনও চিকিৎসা হয়নি!

কিসের চিকিৎসা।

সুরমা সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কাঁদতে থাকল। আমার কী হবে!

তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন— ঠিকই চলে যাবে সব। তুমি অকারণ চিন্তা করছ।

তিনি বললেন, বাড়ি থেকে একা ছাড়া হয় না। অফিসে একা থাকি না, এখানেও একা নই। তোমার কাছে থাকলে তোমার কাকিমা নিশ্চিন্ত থাকেন। এত রাতে আর ডাকাডাকি করে ঝামেলা বাড়িও না।

তবু কেন যে মনে হল এই পরিস্থিতে মানুষটা হারিয়ে গেলে কিছুই কাউকে বলতে পারতেন না। অসুখটা পারকিনসন অসুখ যদি হয়, তবে তো নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনাও আর থাকে না।

একজন সুস্থ মানুষের এই পরিস্থিতিতে সুরমা কী করবে ভেবে পেল না। সকালে উঠে মাসিমাকে ফোন করে সব বলতে হবে।

সস্নেহে সুরমা তাকে তুলে ধরতে গেলে তিনি ক্ষেপে গেলেন।

তোমরা আমাকে কী ভাবো বলত!

উঠুন। শোবেন।

উঠছি। লাস্ট ট্রেন চলে যাচ্ছে।

রাত তো অনেক হল বাবু।

তিনি আর কথা বললেন না। শুধু সুরমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তুমি এত সুন্দর সুরমা—

ঠিক আছে শুয়ে পড়ুন।

তিনি শুয়ে পড়লে একটা হালকা চাদর গায়ে জড়িয়ে দিল সুরমা।

সাদা বিছানায় সে তার বালিশ রেখে বলল, আমি আছি, পাশেই আছি। কোনও অসুবিধা হলে ডাকবেন।

তাঁর খুব বেশি যে নেশাও হয়েছে, তাও না। সে নিজেও খুব পরিমিত খেয়েছে, সারারাত জেগে সকালে খবরটা না দিতে পারলে স্বস্তি নেই তার।

সুরমা পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

তিনি সুরমার শরীরে হাত রাখলেন, মনোরম স্পর্শ সুরমার শরীর কেঁপে উঠল। সারা শরীর কেমন অমৃতময় হয়ে যাচ্ছে— এক আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে নিমেষে এক অমোঘ সৌন্দর্য তৈরি হচ্ছে দু'জনের মধ্যে।

আলো নেভানো।

অন্ধকার। তার মধ্যেই স্নিগ্ধ বেলফুলের ঘ্রাণ এবং সুরমার চিত্ত বিকল— যেন নদী পার হয়ে কোথাও তারা রওনা হয়েছে— পাখিরা উড়ছে, আর সবুজ হয়ে যাচ্ছে এই ধরণী। কে বলবে, মানুষটার এত স্মৃতিবিভ্রম হয়। হাতের কোমল স্পর্শে বিদ্যুৎ সংলগ্ন হয়ে দু'জনেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দেখে সুরমা, তিনি নেই। দরজা খোলা। বাগানে বসে থাকতে পারেন। সে উঁকি দিয়ে দেখল, তিনি বাগানেও নেই। লালগোলা ফার্স্ট ট্রেন ধীরে ধীরে স্টেশনে ঢুকছে।

পিছনের দরজা খুলে সুরমা ডাকল, সুকুমারী, সুকুমারী, তোমার দাদাবাবু কোথায়। ইস্‌, সে কখন ঘুমিয়ে পড়ল। কেন যে ঘুমিয়ে পড়ল! তাঁকে আর কোথায় সে খুঁজবে। সুকুমারী বলল, এদিকের সব দরজাই বন্ধ বউদি।

হারিয়ে গেলেন তিনি। হই চই শুরু হয়ে গেল— কোথায় যেতে পারেন। একেবারে জলের বুদবুদের মতো এত বড় মানুষটা হারিয়ে গেল। সুরমা ছাড়া আর মাসিমার কিছুটা শোক দেখা গেল? আর তাঁর মেয়ে অরুন্ধতীকে কেউ নাকি সামলাতে পারছে না। সে কাঁদছে, আমার বাবাকে এনে দাও।

অলংকরণ **অরিন্দম মজুমদার**